সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

জুন ২০১৫

বিশেষ যোগ সংখ্যা

যুক্ত কর হে যোগের সঙ্গে...

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশ সফর

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ তেতালিশ | সংখ্যা ০৬ | জ্যৈষ্ঠআষাঢ় ১৪২২ | জুন ২০১৫

www.hcidhaka.gov.in
Facebook page: /IndiaInBangladesh; @ihcdhaka
IGCC Facebook page: /IGCCDhaka
Bharat Bichitra
Facebook page: /IndiaInBangladeshBharatBichitra

যোগ কী এবং কেন?

গর্ভাবস্থায় যোগ

সূচিপত্র

যোগ কী এবং কেন? ০৪
গর্ভাবস্থায় যোগ ০৬
যুক্ত কর হে যোগের সঙ্গে ১০
আসুন যোগ অনুশীলন করি ১৩
বাংলাদেশে যোগের উৎপত্তি ও বিকাশ ১৬
মানব কল্যাণ, স্বাস্থ্য, শারীরিক সক্ষমতা ও থেরাপির জন্যে যোগানুশীলন ২০
কবিতা ২৪
ছোটগল্প: আত্মজ্ঞান ২৬
ভারতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ৩০
ধারাবাহিক: রূপকথা ভূতকথা ভালবাসা ৩১
রাজা বিক্রমাদিত্য ও বত্রিশ পুতুলের গল্প ৩৬
ছোটগল্প: কান্না ৩৯
অনুবাদ গল্প: অপরের সুখ ৪২
শেষ পাতা: প্রমথনাথ বিশী ৪৮

১০

যুক্ত কর হে যোগের সঙ্গে

যা আমাদের দেহ মন প্রাণকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সুস্থ রাখে, নীরোগ ও নিরাময় করে, যা আমাদের সকল কাজকর্মের মধ্যে শান্ত সুষম ছন্দ সঞ্চার করে, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের গ্লানি থেকে মুক্ত করে এবং সর্বোপরি যা আমাদের দেহে মনে আবদ্ধ আমিত্বকে দেহমনের সুদূর পারে অসীমের সঙ্গে যুক্ত করে, সেই যোগের সম্বন্ধে আমাদের না জানা বা বেঠিক জানার অন্ত নাই। এই ক্ষুদ্র নিবন্ধ কিছু ভ্রান্ত ধারণার নিরসন ঘটিয়ে সত্যকে উপস্থাপন করবার সামান্য প্রয়াস।

প্রচারমাধ্যমের কল্যাণে আজকাল কয়েকটি যোগাসন এবং প্রাণায়াম প্রায় সকলেই জেনে গেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ভাবেন যোগের আদ্য, মধ্য এবং অন্ত তাঁদের করতলগত। এমন কী তাঁদের যোগশিক্ষক হবার যোগ্যতাও যথেষ্ট। ব্যাপারটা ঠিক অতটা সহজ নয়। হাজার হাজার বছর আগে যখন প্রচলিত সুগঠিত ধর্মগুলির উদ্ভব ঘটেনি তখন কিছু মানুষের অদম্য স্পৃহা, জীবনজিজ্ঞাসা এবং নিরন্তর সাধনার ফলে আমাদের এই অবিভক্ত উপমহা দেশে যোগের অভ্যুদয় ঘটেছিল। তাঁদের শরীর এবং মন প্রাণ নিয়ে পরীক্ষানিরী ক্ষা এবং নিজ অভিজ্ঞতালব্ধ বিজ্ঞানসম্মত সত্য আমাদের বিস্ময়ে হতবাক করে দেয়। বিজ্ঞানের বিশেষত পদার্থবি জ্ঞানের সাম্প্রতিকতম আবিষ্কার আমাদের সেই বিস্ময় আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

সম্পাদক নান্টু রায়
ফোন ৯৮৫০১৯৩৭, ৯৮৮৮৭৮৯৯১ এ ক্স: ১৪৯
ফ্যাক্স ৮৮০২৯৮৮২৫৫ ৫, e-mail: informa@hcidhaka.gov.in

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ভারতীয় হাই কমিশন
বাড়ি নং ২ সড়ক নং ১৪২ গুলশান১ ঢাকা১২১২

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
গ্রাফিক্স নূরন নাহার

মুদ্রণ গ্রাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি.
৫৫/১ পুরানা পল্টন ঢাকা১০০০ ফোন ৯৫৫৪৮০৪

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই
এই পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

পাঠকের পাতা

নিয়মিত প্রেরণের অনুরোধ

শিক্ষাবিদ মুহিবুর রহমান চৌধুরী স্মৃতি পাঠাগার হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার অজ পাড়াগাঁয়ের অহংকার। পাঠাগারে বর্তমানে বইয়ের সংখ্যা তিন হাজারের অধিক। এই পাঠাগারে ইতিহাসঐতিহ্য, বিজ্ঞানসমৃদ্ধ বইসহ বাংলাদেশ ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পত্রপত্রিকা এবং ম্যাগাজিন সংগ্রহ অব্যাহত রয়েছে। প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে পাঠাগারের পক্ষ থেকে *বর্ণমালা* নামে ছোট কাগজ প্রকাশ করা হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে *বিজয় নিশান*। এছাড়াও পাঠাগারের পক্ষ থেকে সাহিত্যসংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্যবিষয়ক পত্রিকা *মাসিক নবীগঞ্জ দর্পণ* প্রকাশিত হচ্ছে। প্রতিদিন অগণিত পাঠক পাঠাগারে বই ও পত্রিকা পড়তে ভিড় জমায়।

আমরা পাঠাগারের পক্ষ থেকে ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত *ভারত বিচিত্রা* কর্তৃপক্ষের কাছে শিক্ষাবিদ মুহিবুর রহমান চৌধুরী স্মৃতি পাঠাগারে আপনাদের বহুল প্রচারিত ও তথ্যবহুল মাসিক পত্রিকা ও হাই কমিশন থেকে প্রকাশিত অন্যান্য প্রকাশনা প্রেরণের বিনীত অনুরোধ জানাই।

এম গৌছুজ্জামান চৌধুরী
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি
শিক্ষাবিদ মুহিবুর রহমান চৌধুরী স্মৃতি পাঠাগার
কসবা (ফরহাদপুর), ডাকঘর-লিপাইগ ঞ্জ-৩৩৭৪
নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ

পাঠক হতে চাই

বিশাল ভারত, বিশাল তার বিচিত্রা– *ভারত বিচিত্রা* পড়ে শুধু মুগ্ধ হইনি, ভারত সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পেরেছি। আমরা বিবেকান্দ চর্চা পর্ষদ দাড়িয়াপাড়া, সিলেট থেকে আমাদের মুগ্ধতা জ্ঞাপন করছি। এই পর্ষদে প্রতি সপ্তাহের শুক্রবার পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। তাই বিশেষ অনুরোধ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দের পাশাপাশি আমরা *ভারত বিচিত্রায়* নিয়মিত পাঠক হতে চাই।

বেণুভূষণ দাশ সভাপতি
বিবেকানন্দ চর্চা পর্ষদ
দাড়িয়াপাড়া, সিলেট

বাধিত হব

ভারতীয় দূতাবাস কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণকৃত *ভারত বিচিত্রার* আমি একজন অনুরাগী পাঠক। অথচ এটি আপনাদের কাছ থেকে সরাসরি পাওয়া ছাড়া অন্য পথ নেই। ফরিদপুর ডায়াবেটিক সমিতির সম্পাদক এক কপি পেয়ে থাকেন। আমি আগে পেতাম, এখন পাই না। পত্রিকাটি আমার ঠিকানায় পাঠানো হলে বিশেষ বাধিত হব।

অধ্যাপক এম এ সামাদ এডভোকেট
এ আর বকাউল সড়ক
দক্ষিণ কালীবাড়ি, ঝিলটুলী, ফরিদপুর

চমৎকার প্রকাশনা

আমি *ভারত বিচিত্রার* এক ভক্ত পাঠক। বহু দিন যাবত ফরিদপুর শহরের আফজল আলী খান এবং চুয়াডাঙ্গার হায়দার মাস্টার সাহেবের কাছ থেকে ফেরত দেবার কড়ারে ভারত বিচিত্রা পাঠ করে আসছি। ভাল লাগার সীমা নেই। বছর দুইতিন হ তে চলেছে গ্রাহক হব হব ভাবছি– আজকাল ক রে এ পর্যন্ত আলস্যবশত তা আর হচ্ছে না। তাই ভাবলাম লিখে দেখি গ্রাহক হতে পারি কিনা। যদি চাঁদা দিতে হয় তবুও রাজি– গ্রাহক হতেই হবে। কারণ, চমৎকার প্রকাশনা।

আমাকে *ভারত বিচিত্রা* পাঠাবেন এই অনুরোধ অনুজ্ঞাণ। সম্ভব হলে ২০১৫ সালের বিগত সংখ্যাগুলো পাঠাবার অনুরোধ জানাই।

এম এম গোলাম সারোয়ার সভাপতি
ওয়ার্ল্ড রেডিও লিসনার্স ক্লাব
মধুখালী, ফরিদপুর

ইচ্ছা পোষণ করছি

আপনার সুস স্পাদিত *ভারত বিচিত্রার* বেশ ক'টি সংখ্যা পাঠ করেছি এবং খুব ভাল লেগেছে। পত্রিকাটির নিয়মিত কপি পেলে আরো সমৃদ্ধ হতাম। আমি সকল নিয়মকানুন মেনে *ভারত বিচিত্রার* গ্রাহক হবার ইচ্ছা পোষণ করছি।

মেহেদী হাসান বিপুল
সাধারণ সম্পাদক
জলছবি সাংস্কৃতিক পরিবার
কিশোরগঞ্জ

সংগ্রহে রাখতে চাই

শহীদ আসাদরফি গ্রন্থাগার খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলার একমাত্র গণগ্রন্থাগার যার প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৬৯। দীর্ঘদিন যাবৎ প্রতিষ্ঠানটি এলাকার পাঠকদের চাহিদা পূরণ করে আসছে। এখানে পাঠকদের জন্য দৈনিক এবং সাপ্তাহিক মিলে ৬টি পত্রিকা রাখা হয়।

বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পারলাম যে, আপনাদের দপ্তর থেকে প্রকাশিত *ভারত বিচিত্রা* আপনারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করে থাকেন। আমরা আপনাদের পত্রিকাটি গ্রন্থাগারের সংগ্রহে রাখতে ও পাঠকদের সরবরাহ করতে চাই।

এমএ মোস্তাকিন সভাপতি
শহীদ আসাদরফি গ্রন্থাগার
ফুলতলা বাজার, খুলনা

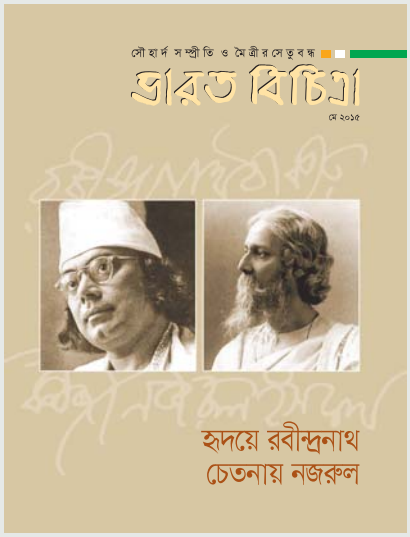

উপায় কি

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ *ভারত বিচিত্রা* বাংলাদেশ এবং ভারতের জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি করেছে। দু'দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, কবিতা যেন একইসূত্রে গাঁথা। বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী দেশ ভারত সম্পর্কে জানতে হলে একমাত্র জনপ্রিয় *ভারত বিচিত্রা* পড়া চাই এবং এর কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদানের কথা বলে শেষ করা যাবে না।

আমি দীর্ঘদিন যাবত নিয়মিতভাবে *ভারত বিচিত্রা* পাঠ করেছি। ১৯৮৯ সালে পাবনা থেকে আমি ঢাকায় চলে আসি। এরপর থেকে আর নিয়মিতভাবে পত্রিকাটি পড়া হয়নি। মাঝে মাঝে বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করে পড়ে থাকি। নিয়মিত পড়তে চাইলে উপায় কি?

সৈয়দ একরামুল হক প্রিন্সিপাল অফিসার
অগ্রণী ব্যাংক লি. তেজগাঁও শি/এ কর্পোরেট শাখা
৩১৫/এ, তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা১২১৫

নির্ভরযোগ্য মনে করি

বহুল প্রশংসিত *ভারত বিচিত্রার* গ্রাহক হিসেবে চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়ায় অবস্থানকালে আপনাদের সরবরাহকৃত মাসিক সংখ্যাটি যথাসময় আমার ঠিকানায় পৌঁছে যেত। বেশ কিছুদিন হল আমার নিজ অঞ্চল বরিশালে আসার পর নানান ব্যস্ততায় ঠিকানা পরিবর্তনের বিষয়টি আপনাদের অবহিত করা হয়নি কি আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি। প্রায় সমাপ্তির পথের চাকরিজীবন সময় কাটানোসহ মনের খোরাক ও চিত্তবিনোদনের মাধ্যম হিসেবে ভারত বিচিত্রাকে নির্ভরযোগ্য মনে করি। আমার বর্তমান কর্মস্থলে কি ভারত বিচিত্রা পাঠানো সম্ভব?

নিখিলচন্দ্র মিশ্র অফিসার
সোনালী ব্যাংক লি. বরিশাল কর্পোরেট শাখা

সম্পাদকীয়

২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। ২০১৪ সালের ১১ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৯তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে যোগানুশীলনের উপকারিতা সম্পর্কে বিশ্ববাপী সচেতনতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এক সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

যোগানুশীলন একটি প্রাচীন জীবনাচরণ পদ্ধতি যার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করা সম্ভব। ভারতের ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা বুঝেছিলেন, শুধু পার্থিব চিকিৎসা ব্যক্তির শরীরের ব্যাধির কিছু উপশম করলেও তাঁর সার্বিক কল্যাণের জন্যে অপার্থিব কিছু প্রয়োজন। যোগ হচ্ছে পার্থিব-অপার্থিবের সেই আশ্চর্য সম্মিলন যার মধ্য দিয়ে মানুষ শরীরে ও মনে সুস্থ জীবন যাপন করতে পারে। এই চিকিৎসা পদ্ধতিই আজ বিশ্বজুড়ে যোগ, যোগব্যায়াম বা যোগচিকিৎসা নামে খ্যাত। বিভিন্ন চিকিৎসার জটিল প্রক্রিয়ায় ও প্রায়োগিক প্রতিক্রিয়ায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে আজকের মানুষ যোগচিকিৎসা গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়ে উঠছে।

মনে করা হয় পৃথিবীর প্রাচীনতম সিন্ধু সভ্যতার সময় থেকেই যোগের উদ্ভব ঘটেছিল। বৈদিকযুগে যোগের বহুল প্রচার ছিল এবং বুদ্ধদেবের সাধনা ও শিক্ষণের একটি বড় অংশ যুড়ে আছে যোগ ও ধ্যান। অতি প্রাচীনকালেই যোগ চিন জাপান তিব্বত ও অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে।

মনে রাখতে হবে, যোগ কোন ধর্মীয় বিষয় নয় এবং এটি কোনভাবেই হিন্দু ধর্মের সোপান নয়। এটি সম্পূর্ণভাবে মানবিক, প্রক্রিয়ামূলক এবং বিজ্ঞানসম্মত। যোগের সঙ্গে কোন ধর্মেরই কোন বিরোধ নেই বরং এটি বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসীদের নানাভাবে সাহায্য করতে পারে। যোগে কোন মতামত চাপিয়ে দেওয়া হয় না বরং এতে মন বন্ধনহীন উন্মুক্ত হয়। দেহ মন ও প্রাণের মধ্যে ভারসাম্য এনে আমাদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ ঘটানোই যোগের লক্ষ্য। যোগ মানুষের চেতনার সীমাহীন প্রসার ঘটায় ফলে মনের অন্ধকার দূর হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নৈতিক জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধিত হয়।

২১ জুনকে সামনে রেখে *ভারত বিচিত্রার* চলতি সংখ্যায় যোগের ওপর প্রকাশিত ৬টি নিবন্ধে যোগ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। যোগপিপাসু মানুষের কাছে এ আয়োজন কিঞ্চিৎকর মনে হলেও তাদের মনে যদি আগ্রহের স্ফূলিঙ্গমাত্র প্রজ্জ্বলিত হয় তাহলে আমাদের আয়োজন সার্থক বলে মনে করব।

পৃথিবীর সর্বত্রই আজ যোগ অনুশীলিত হয়ে থাকে। ভারতীয় পুরাণ ও প্রাচীন পুঁথিপত্রে যোগের মূল নিহিত হলেও আজ আধুনিক বিশ্বের প্রতিটি জাতি ও সমাজের জীবনে যোগ ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে। বিশ্বের প্রতিটি ভাষায় এখন যোগ-সাহিত্য পাওয়া যায়। যোগ এখন বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য ও কুশল-শিল্পের এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে।

প্রচ্ছদ রচনা

যোগ কী এবং কেন?

দীপেন সেনগুপ্ত

প্রথমে শরীর, তারপর মনের সম্মিলনে গড়ে ওঠে মানুষের সত্তা। এই পৃথিবীতে সর্বোত্তম প্রাণময় সত্তা হল মানুষ। নিজের জীবৎকালের সীমার মধ্যে মানুষ চায় নীরোগ দেহ ও প্রফুল্ল মন নিয়ে বাঁচতে। কিন্তু একই সঙ্গে সুস্থ শরীর ও আনন্দে পরিপূর্ণ মনের সংযোগ এখন প্রায় দুর্লভ। নানাবিধ আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থাও এই কাজে সাফল্য লাভ করতে পারেনি। অথচ প্রাচীন ভারতের মনীষীরা এমন একটি চিকিৎস্যপ দ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন, যার সাহায্যে মানুষ সুস্থ জীবনযাপনে সক্ষম হবে শরীরে ও মনে। এই পদ্ধতিই আজ বিশ্বজুড়ে যোগ, যোগ্যব্যায়াম বা যোগচিকিৎসা নামে বিখ্যাত। বিভিন্ন চিকিৎসার জটিল প্রক্রিয়া ও প্রায়োগিক প্রক্রিয়ায় বীতশুদ্ধ হয়ে আজকের মানুষ যোগচিকিৎসা গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়ে উঠছে।

যে রোগহীন জীবনের দিশা যোগচিকিৎসা দিয়েছে তার মূলে আছে যোগদর্শনে উল্লিখিত অষ্টাঙ্গযোগের তৃতীয় অঙ্গ 'আসন'। আসন অর্থাৎ আস্নন। 'আ' অক্ষরের অর্থ সর্বত্র। 'স' অর্থাৎ ঈশ্বর। আর 'ন'র অর্থ জ্ঞান। সর্বত্র ঈশ্বরজ্ঞান অর্থাৎ সমস্ত প্রতিকূলতা, প্রতিবন্ধকতা জয় করে উদার চেতনার পথে উত্তরণই যোগের লক্ষ্য। দেহতরঙ্গকে অবরোধক বিজ্ঞানের দ্বারা জয় করাই আসন সাধনার মূল ও একমাত্র পথ।

প্রতিটি আসন করার ক্ষেত্রে উৎসমূল, নামকরণ, আর্ষধারা, মানসিক যোগ্যতা, কী করে করতে হয়, বিকল্প আসন, নিশ্বাস্নপ্রশ্বাস, ভাবনা, অভ্যাস, সময়, উপকারিতা ও নিষেধ এই বারোটি বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকা জরুরি।

যে দেহটা আমাদের কাছে দৃশ্যমান তাকে স্থূলদেহ বা অন্নময়কোষ বলে। আর মানসিক দেহকে তাঁরা চারভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগকে বলেছেন প্রাণময় কোষ, দ্বিতীয় ভাগকে বলেছেন মনোময় কোষ, তৃতীয় ভাগকে বলেছেন বিজ্ঞানময় কোষ, সর্বশেষকে বলেছেন আনন্দময় কোষ। স্থূলদেহ থেকে সূক্ষ্মদেহের পার্থক্য খুব সামান্য। স্থূলদেহের দরকার হল 'প্রয়োজন' আর সূক্ষ্মদেহের দরকার হল 'চাহিদা'।

দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহকে সুনির্দিষ্ট কিছু প্রক্রিয়ায় সঞ্চালন এবং সংস্থাপন করে অর্থাৎ আসনের সাহায্যে দেহের ও মনের রোগ, অবসাদ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

ভারতীয় ঋষিদের মতে, একটা মানুষের দেহের মধ্যে পাঁচটা দেহ বর্তমান। যে দেহটা আমাদের কাছে দৃশ্যমান তাকে স্থূলদেহ বা অন্নময়কোষ বলে। আর মানসিক দেহকে তাঁরা চারভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগকে বলেছেন প্রাণময় কোষ, দ্বিতীয় ভাগকে বলেছেন মনোময় কোষ, তৃতীয় ভাগকে বলেছেন বিজ্ঞানময় কোষ, সর্বশেষকে বলেছেন আনন্দময় কোষ। স্থূলদেহ থেকে সূক্ষ্মদেহের পার্থক্য খুব সামান্য। স্থূলদেহের দরকার হল 'প্রয়োজন' আর সূক্ষ্মদেহের দরকার হল 'চাহিদা'। মানসিক দেহের চাহিদা যখন স্থূলদেহের প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হয়, তখন স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহের দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। তৈরি হয় নানা আধ্বিব ্যাধি। আধি বলতে মানসিক রোগ বা বিক্ষেপকে বলা হয়। আর ব্যাধি বলতে ধরা হয় শারীরিক রোগ বিকারকে।

পৃথিবীতে প্রতিটি জীবজন্তু গাছপালা মানুষজন যে জীবিত আছে, তার জন্য মহাজাগতিক সূক্ষ্মরশ্মির তরঙ্গ মাথার ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে প্রবেশ করে দেহমন কে জারিত করে হাতুপা য়ের মধ্য দিয়ে বের হয়ে যায়। এটা সুস্থ ও স্বাভাবিক লক্ষণ। কিন্তু বিভিন্ন অবস্থায় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সেই তরঙ্গ অনেক সময় ছিন্ন হতে হতে চলে। এভাবে কিছুদিন চলতে চলতে তরঙ্গের একটা বিপরীত তরঙ্গ দেখা দেয়। অর্থাৎ আগে আকাশ থেকে দেহের মধ্যে দিয়ে মাটিতে তরঙ্গ আসছিল, এবার মাটি থেকে দেহের মধ্যে দিয়ে তরঙ্গ আকাশে যেতে আরম্ভ করল। এখান থেকে আধ্বিব ্যাধি শুরু হল। মাথা থেকে পায়ের দিকে মূল তরঙ্গস্রোত ফিরিয়ে দিতে ও বর্তমানে দেহে প্রবাহিত বিপরীত তরঙ্গকে নিম্নমুখী করতে প্রয়োজন কতগুলো বিশেষ ক্রিয়া। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা এই বিশেষ ক্রিয়াকে ৬৪ ভাগে ভাগ করেছেন– আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম, শুদ্ধাহার, জীবনযাত্রার আচারবিচার, খাদ্যতত্ত্ব, মালিশ, স্নানবিধি, ভেষজ, ধ্যান, ভগবত উপাসনা প্রভৃতি তার কয়েকটি। এই বিশেষ ক্রিয়া, ৬৪ ধারার মধ্যে দিয়ে সঠিক পথে জীবনকে চালিত করাকে বলা হয় যোগ। কিন্তু নিজেদের অজ্ঞতার জন্য শুধু আসনকে অনেকে যোগ বলে আখ্যায়িত করে থাকে।

অসুস্থ হলে শরীরের স্বাভাবিক রাসায়নিক বিক্রিয়া বিঘ্নিত হয়। ওষুধ এই রাসায়নিক বিক্রিয়া সুসম্পন্ন হতে সাহায্য করে। অসুবিধা হল যে, ওষুধ দেহে প্রবেশ করা মাত্র কাজ শুরু করে দেয়। ফলে রোগীর ঠিক কতটুকু প্রয়োজন তা পরিমাপ করা সম্ভব হয় না। ওষুধের প্রয়োগ মানে দেহ ও মনের ওপর জোর দিয়ে কাজ করানো। যোগ ওষুধ ছাড়াই এই কাজ সুচারুভাবে করে।

মহর্ষি পতঞ্জলি পাতঞ্জল যোগদর্শনের অষ্টাঙ্গযোগে মানুষকে উত্তরণের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ধারণা, ধ্যান ও সমাধির কথা বলেছেন। যম সাধনায় রয়েছে পাঁচটি অঙ্গ– অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। এটা সম্পূর্ণ মানসিক চেতনা, একে দম অর্থাৎ অন্তরেন্দ্রিয় নিগ্রহ বলা যায় যার ভিত্তি হল আদর্শ। আবার অষ্টাঙ্গযোগের দ্বিতীয় অঙ্গ নিয়মে রয়েছে শৌচ (দৈহিক ও মানসিক শুদ্ধি), সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান। এই নিয়মের অন্তর্গত হচ্ছে শম বা রহিরিন্দ্রিয় সংযম। অষ্টাঙ্গযোগের তৃতীয় অঙ্গ হল আসন। দেহতরঙ্গকে অবরোধক বিজ্ঞানের দ্বারা জয় করাই আসন সাধনার মূল ও একমাত্র পথ।

দীপেন সেনগুপ্ত
পরিচালক, স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট
অফ কালচার যৌগিক কলেজ
প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অফ কালচার

অসুস্থ হলে শরীরের স্বাভাবিক রাসায়নিক বিক্রিয়া বিঘ্নিত হয়। ওষুধ এই রাসায়নিক বিক্রিয়া সুসম্পন্ন হতে সাহায্য করে। অসুবিধা হল যে, ওষুধ দেহে প্রবেশ করা মাত্র কাজ শুরু করে দেয়। ফলে রোগীর ঠিক কতটুকু প্রয়োজন তা পরিমাপ করা সম্ভব হয় না। ওষুধের প্রয়োগ মানে দেহ ও মনের ওপর জোর দিয়ে কাজ করানো। যোগ ওষুধ ছাড়াই এই কাজ সুচারুভাবে করে।

প্রচ্ছদ রচনা

গর্ভাবস্থায় যোগ

তৃপ্তি মেহতা দেশপাণ্ডে

'আপনি গর্ভবতী অথচ যোগানুশীলন করছেন?' 'গর্ভাবস্থায় আপনি কিভাবে যোগানুশীলন করতে পারেন?', 'যোগানুশীলন বন্ধ করুন, আপনি এখন গর্ভবতী', 'যোগানুশীলনের সময় সতর্ক থাকুন' ইত্যাদি ইত্যাদি, আমি গর্ভবতী জানার পর প্রতিক্রিয়া ও প্রশ্নমালা ছিল আমার পরিবার, বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের।

আপনি যখন যোগ শব্দটি শোনেন, অধিকাংশ মানুষ মনে করে এটা হচ্ছে কিছু আসন করা, মাথা বাঁকিয়ে, ঘাড় বাঁকিয়ে শুধু শরীরকে কষ্ট দেওয়া। জানা উচিত, যোগ হচ্ছে অষ্টাঙ্গপথ জীবনশৈলী, শুধু আসন নয়।

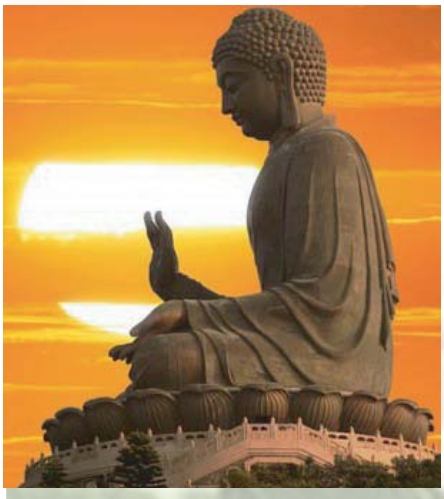

যোগ সম্পর্কে ভুল ধারণার কারণে অনেকে মনে করেন, গর্ভকালীন সময়ে যোগানুশীলন থেকে বিরত থাকা উচিত। এটা ঠিক যে, গর্ভকালীন বিহ্বল সময়ে প্রত্যেকটি মায়েরই সতর্ক থাকা উচিত। তবে গর্ভাবস্থাকে অসুখ ভাববেন না দয়া করে, এসময় আপনি যথাযথ খাবার খাবেন, বিশ্রাম নেবেন। তবে আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, গর্ভাবস্থার আগে ও পরে এবং গর্ভাবস্থায় যোগনুশীলন আপনার মাতৃত্বের যাত্রায় (অর্থাৎ গর্ভাবস্থায়, জন্মদান, নবজাতক ও আপনার নিজের যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে) প্রভূত মানসিক ও শারীরিক শক্তি যোগায়। শুধু তাই নয়, যোগ আপনার শরীরকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। গর্ভাবস্থায় সন্তান জন্মের আগে যোগ কেন মঙ্গলজনক? গর্ভাবস্থায় শরীরে প্রভূত পরিবর্তন আসে। গর্ভাশয়ের মধ্যে যখন নতুন একটি শরীর বাড়তে থাকে, তখন প্রচুর শক্তি ও সামর্থ্য প্রয়োজন হয় ভারবহনক্ষম হবার জন্যে। গর্ভাশয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরে চাপ বাড়তে থাকে। এর ফলে শরীরের সাম্যাবস্থার পরিবর্তন ঘটে যা পৃষ্ঠদেশের নীচের

দিককার

পেশিকে অতিরিক্ত কাজ করতে ও চাপ নিতে বাধা দেয়। শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হরমোনের পরিবর্তনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যোগাসন পা, কোমর, পৃষ্ঠদেশ, শ্রোণিদেশ, বাহু ও কাঁধ শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। যোগ শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে, শরীরের গ্রন্থি ও পেশির ঘূর্ণন বৃদ্ধির ফলে স্ফীতি কমে, শক্তি বাড়ে।

গর্ভকালীন হরমোন শুধু শরীর নয়, মন ও ভাবাবেগেও পরিবর্তন আনে। প্রাণায়াম ভাবাবেগের উত্থান-পতনে সাহায্য করে এবং সার্বিক শক্তি ও মনে প্রয়োজনীয় শিথিলতা আনে। গর্ভকালীন সময়ে যথাযথ শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ, গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ পদ্ধতি চাপ ও দুশ্চিন্তা হ্রাসে সাহায্য করে। শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগের বিন্যাসে মনোনিবেশ করার মাধ্যমে, শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগের নির্দেশনায় পরিবর্তন এনে যে কেউ তার শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন। আর শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পর্কে সচেতনতা থেকে আত্মসচেতনতার সূচনা। আত্মসচেতনতা সাহায্য করে আপনার শরীরে-মনে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটছে, সে সম্পর্কে সজাগ হতে। যোগানুশীলন যেহেতু শরীর-মন সম্পর্কে অবগত হতে সাহায্য করে, কাজেই যোগ শরীরের সঙ্গে সংযোগ সাধন করে।

গর্ভাবস্থায় যোগানুশীলনে কতিপয় বিবেচ্য বিষয়

১. প্রশিক্ষিত নির্দেশকের যথাযথ তত্ত্বাবধানে যোগানুশীলন করতে হবে।
২. আপনার গাইনোকোলজিস্টের সঙ্গে আলাপ করে আপনার যোগানুশীলন, আসন সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করুন।
৩. আপনি যদি কখনও যোগানুশীলন না করে থাকেন, ধীরে ধীরে অগ্রসর হন। শ্বাস গ্রহণ ও শ্বাস ত্যাগ কৌশল দিয়ে প্রথমে শুরু করুন। কখন, কিভাবে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করতে হবে জানুন। জানুন কিভাবে গভীর শ্বাস নেবেন এবং শরীরকে শিথিল করে দেবেন।
৪. গর্ভাবস্থায় ১০ থেকে ১৪ সপ্তাহের মধ্যে আসন অনুশীলন না করার অনুরোধ করা যাচ্ছে। কারণ এ সময়টা শিশুর বৃদ্ধির জন্যে অতীব

গুরুত্বপূর্ণ।

৫. ওয়ার্ম-আপ দিয়ে শুরু করুন। হাত-পা ছোড়া শরীরের ওয়ার্ম আপ করার এক চমৎকার পন্থা।

৬. প্রচুর জল পান করুন। শরীর জলযুক্ত রাখুন। তবে খেয়াল রাখবেন যোগানুশীলনের সময় যেন জলথলিতে কোন জল না থাকে।

৭. গর্ভকালীন সময়ের প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ প্রথম তিন মাসে বমি হতে পারে, চাল-চলনে কিছু পরিবর্তন আসতে পারে। যোগানুশীলনের প্রথমাবস্থায় বীরভদ্রাসন, বৃক্ষাসনের মত দাঁড়ানো আসনের চর্চা করা যেতে পারে। এর ফলে দুই পা ও গ্রন্থি মজবুত হবে এবং ভারসাম্য বজায় রাখা সহজ হবে।

৮. গর্ভকালীন সময়ে বিড়াল, প্রজাপতি, উবু হয়ে বসা এবং উজ্জয়ীর মত শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুশীলন করা যেতে পারে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তিন মাসে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ ও ধ্যান করা যেতে পারে। বিপরীত কার্নি-র মত বিপরীত আসন, তলপেটে চাপ পড়ে এমন আসন, কিংবা গভীরভাবে সামনে এগিয়ে আসা কিংবা পেছনের দিকে বেঁকে যাওয়ার মত আসন এড়িয়ে চলুন। চিৎ হয়ে শোয়া থেকে বিরত থাকুন যাতে জরায়ুতে রক্ত চলাচল সহজ হয়। যোগানুশীলনের সময় কখনও শ্বাস ধরে রাখবেন না। শ্বাস বন্ধ রাখা– প্রাণায়াম ধরনের চর্চা থেকে বিরত থাকবেন।

৯. আত্মস্থ হওয়ার জন্য প্রাণায়াম, শরীর শিথিল করে দেওয়া, ধ্যান বা মন্ত্রোচ্চারণ বন্ধ করা।

১০. উষ্ণ কক্ষে যোগানুশীলনের চেষ্টা না করা।

১১. সবসময় আপনার শরীরকে জিজ্ঞাসা করুন, আপনার সাধারণ জ্ঞান ব্যবহার করুন এবং আপনার স্বাভাবিক ছন্দে চলুন।

সুস্থ গর্ভাবস্থার জন্য যম, নিয়ম

১. হাঁটা ও সাঁতার কাটা হচ্ছে সর্বোত্তম ব্যায়াম যা যোগের সঙ্গে যুক্ত।

২. আপনাকে যদি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, বিশেষ করে গর্ভাবস্থার শেষ দিকে, পায়ের ওপর চাপ পড়তে পারে। আরাম পেতে পায়ের পাতা উঁচু করুন। আপনার যদি বসার চাকরি হয়, পায়ের পাতা উঁচু রাখতে একটি ছোট টুল স্থাপন করুন।

৩. আপনি কেমন অনুভব করেন, সেখানে খাবার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খাদ্যে বিষক্রিয়া রোধে এবং মানসম্পন্ন খাবার নিশ্চিত করতে ঘরে তৈরি টাটকা খাবার খান।

৪. ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ক্যালসিয়াম, আয়রনের মত সম্পূরক খাদ্য গ্রহণ করুন। এছাড়াও সুষম খাবার (সঠিক পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, চর্বি, আঁশযুক্ত খাবার, ভিটামিন, মিনারেল প্রভৃতি) গ্রহণ খুবই জরুরি। অত্যাবশ্যকীয় ভিটামিন ও মিনারেলের জন্য গর্ভবতী নারীকে প্রতিদিন ২/৩ ধরনের ফল ও শবজি খেতে হবে। এর ফলে গর্ভাবস্থার সাধারণ সমস্যা কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্ত থাকা যাবে।

৫. গর্ভাবস্থা মানে আপনাকে চিনি, ময়দা, চর্বিযুক্ত প্রচুর পরিমাণ মিষ্টিজাতীয় খাদ্য খেতে হবে, এটা ভুল ধারণা। গর্ভাবস্থায় আপনাকে দিনে দু'বার খেতে হবে, এটাও আরেকটা ভুল ধারণা। প্রকৃতপক্ষে, গর্ভবতী নারীকে তার ক্ষুধার চেয়ে একটু বেশিই খাওয়া উচিত। পরিমাণ নয়, খাদ্যের মানই গর্ভাবস্থায় বেশি দরকার। সুতরাং আপনার শরীরকে জিজ্ঞাসা করুন এবং বুঝেশুনে খান।

৬. গর্ভাবস্থা যত এগিয়ে আসতে থাকে, বিরতি দিয়ে দিয়ে অল্প অল্প

করে খাওয়া উচিত। এর ফলে হজম সহজ হবে, গ্যাস হবে না।

৭. মশলাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন, এত এসিডিটি হবে। গর্ভকালীন সময়ে বুক জ্বালা করা একটি সাধারণ অভিযোগ।

৮. ঘুমাতে যাওয়ার অন্তত দু'ঘণ্টা আগে রাতের খাওয়া সেরে নিন।

আমি মনে করি, গর্ভাবস্থা নারী ও পুরুষের উভয়েরই পরস্পরকে বোঝার, ব্যায়াম ও পুষ্টিবিজ্ঞানসংক্রান্ত বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান ঝালিয়ে নেওয়ার, জীবনশৈলী, খাদ্যাভ্যাসসংক্রান্ত সম্পর্ক স্থাপনের একটা সুযোগ। এটা আপনাকে আপনার ও আপনার পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যপ্রদ জীবন নির্মাণে প্রভূত সাহায্য করবে।

'সমত্বং যোগ উচ্যতে', যোগের সমার্থক শব্দবন্ধ। ভাগবৎ গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এভাবেই যোগের বর্ণনা দিয়েছিলেন। এটা হচ্ছে জীবনের সর্বক্ষেত্রে শরীর ও মনের ভারসাম্য বজায় রাখা। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, গর্ভাবস্থা এমন একটি দশা যেখানে মননের, কর্মের সাম্যাবস্থা খুবই প্রয়োজনীয়। এর ফলে একটি আনন্দপূর্ণ গর্ভাবস্থা হতে পারে যার ফলে আপনি একটি সুন্দর, সুস্থ, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী শিশুর জন্ম দিতে পারেন। এটাই হবে মানবসভ্যতা ও সমাজের প্রতি আপনার মহত্ত্বম অবদান।

তৃপ্তি মেহতা দেশপাণ্ডে প্রশিক্ষক ও অনুশীলক
এসভিওয়াইএএসএ– স্বামী বিবেকানন্দ যোগ অনুসন্ধান সংস্থান

ঘটনাপঞ্জি ❖ জুন

বুদ্ধদেব গুহ

০১ জুন ১৮১৪	❖	কলকাতায় ভারতীয় সংগ্রহালয় প্রতিষ্ঠা
০৩ জুন ১৯৪৩	❖	দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত সুরকার ইলাইয়া রাজার জন্ম
০৫ জুন ১৯৬১	❖	টেনিস তারকা রমেশ কৃষ্ণণের জন্ম
১১ জুন ১৯০১	❖	প্রমথনাথ বিশীর জন্ম
১৬ জুন ১৯২৫	❖	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু
১৬ জুন ১৯৪৪	❖	আচার্য প্রফুলচন্দ্র রায়ের মৃত্যু
১৬ জুন ১৯৪৭	❖	অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীর জন্ম
২০ জুন ১৯২৩	❖	গৌরকিশোর ঘোষের জন্ম
২৫ জুন ১৯৪১	❖	গুরুসদয় দত্তের মৃত্যু
২৬ জুন ১৮৩৮	❖	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম
২৯ জুন ১৮৬৪	❖	স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম
২৯ জুন ১৮৭৩	❖	মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যু
২৯ জুন ১৯৩৮	❖	বুদ্ধদেব গুহের জন্ম

প্রচ্ছদ রচনা

যুক্ত কর হে যোগের সঙ্গে

মথুরানাথ কুণ্ডু

যা আমাদের দেহ মন প্রাণকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সুস্থ রাখে, নীরোগ ও নিরাময় করে, যা আমাদের সকল কাজকর্মের মধ্যে শান্ত সুষম ছন্দ সঞ্চার করে, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের গ্লানি থেকে মুক্ত করে এবং সর্বোপরি যা আমাদের দেহে মনে আবদ্ধ আমিত্বকে দেহমনের সুদূর পারে অসীমের সঙ্গে যুক্ত করে, সেই যোগের সম্বন্ধে আমাদের না জানা বা বেঠিক জানার অন্ত নাই। এই ক্ষুদ্র নিবন্ধ কিছু ভ্রান্ত ধারণার নিরসন ঘটিয়ে সত্যকে উপস্থাপন করবার সামান্য প্রয়াস।

প্রচারমাধ্যমের কল্যাণে আজকাল কয়েকটি যোগাসন এবং প্রাণায়াম প্রায় সকলেই জেনে গেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ভাবেন যোগের আদ্য, মধ্য এবং অন্ত তাঁদের করতলগত। এমন কী তাঁদের যোগশিক্ষক হবার যোগ্যতাও যথেষ্ট। ব্যাপারটা ঠিক অতটা সহজ নয়। হাজার হাজার বছর আগে যখন প্রচলিত সুগঠিত ধর্মগুলির উদ্ভব ঘটেনি তখন কিছু মানুষের অদম্য স্পৃহা, জীবনজিজ্ঞাসা এবং নিরন্তর সাধনার ফলে আমাদের এই অবিভক্ত উপ্লমহা দেশে যোগের অভ্যুদয় ঘটেছিল। তাঁদের শরীর এবং মন প্রাণ নিয়ে পরীক্ষ্মানিরী ক্ষা এবং নিজ অভিজ্ঞতালব্ধ বিজ্ঞানসম্মত সত্য আমাদের বিস্ময়ে হতবাক করে দেয়। বিজ্ঞানের বিশেষত পদার্থবি জ্ঞানের সাম্প্রতিকতম আবিষ্কার আমাদের সেই বিস্ময় আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

মনে করা হয় পৃথিবীর প্রাচীনতম সিন্ধু সভ্যতার সময় থেকেই যোগের প্রচলন ঘটেছিল। বৈদিক যুগে যোগের বহুল ব্যবহার হত এবং বুদ্ধদেবের সাধনা ও শিক্ষণ যোগের দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত। অতি প্রাচীনকালেই যোগ চিন, জাপান, তিব্বত এবং অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন রূপ পায়।

কালক্রমে মহতী যোগের বহমান ধারাটি লুপ্ত না হলেও ক্ষীণ হয়ে পড়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা এবং ইউরোপে বিশুদ্ধ যোগের বহুল প্রচার করেন। পরবর্তীকালে পরমহংস যোগানন্দ তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্থাপনা *সেল্‌ফ রিয়েলাইজেশন ফেলোশিপের* মাধ্যমে লস এঞ্জেলেস থেকে যোগের একটি সুন্দর শিক্ষাক্রম তৈরি করে দূরশিক্ষণ প্রক্রিয়ায় যোগের প্রচার করেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর *যোগ-সমন্বয়* (*Synthesis of Yoga*) মহাগ্রন্থে যোগের নানাদিক নিয়ে বিস্ময়করভাবে বিস্মৃত আলোচনা করেছেন। কৌতূহলী পাঠক উক্ত গ্রন্থটি পড়ে দেখতে পারেন। সাম্প্রতিককালে আমেরিকা এবং ইউরোপে রাজযোগের রহস্যজনক শিক্ষাসমূহ নাম্নে বেনামে বহুল প্রচার পেয়েছে। তবে সব দেশেই হঠযোগের আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম বিকল্প নিরাময়পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত এবং গৃহীত হয়েছে।

বিশুদ্ধ যোগের আদিগ্রন্থ প্রামাণিক তত্ত্ব পাওয়া যায় মহর্ষি পতঞ্জলির যোগসূত্রে। যোগের ব্যবহারিক দিক নিয়ে বিস্মৃত ব্যাখ্যা রয়েছে *গীতায়* এবং আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম সম্বন্ধে প্রক্রিয়ামূলক এবং সামগ্রিক তথ্য পাওয়া যায় *হঠযোগ প্রদীপিকা* গ্রন্থে। আমি পাঠকদের উক্ত গ্রন্থগুলি অনুবাদে হলেও পড়ে দেখতে বলব।

প্রথমেই মনে রাখতে হবে যোগ কোন ধর্মীয় বিষয় নয় এবং এটি কোনভাবেই হিন্দু ধর্মের সোপান নয়। এটি সম্পূর্ণভাবে মানবিক, প্রক্রিয়ামূলক এবং বিজ্ঞানসম্মত। যোগের সঙ্গে কোন ধর্মেরই কোন বিরোধ নেই। বরং এটি বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসীদের নানাভাবে সাহায্য করতে পারে। যোগে কোন মতামত চাপিয়ে দেওয়া হয় না এবং একটি বন্ধনহীন উন্মুক্ত মন তথা মনশূন্যতায় অবস্থানের প্রচেষ্টা করা হয়।

দেহ, মন এবং প্রাণের মধ্যে ভারসাম্য এনে আমাদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ ঘটানোই যোগের লক্ষ্য। এখানে পুঁথিগত জানার প্রতি জোর না দিয়ে 'হয়ে ওঠা'র দিকে জোর দেওয়া হয়। যোগের প্রতি বিশ্বাস ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আপনা থেকে গড়ে ওঠে, চাপিয়ে দেওয়া হয় না। আমরা মানুষ হিসেবে যে যেখানে আছি সেখান থেকেই সরাসরি যোগ শুরু করতে পারি।

একবার একটা চোর এক মহাযোগীর কাছে গিয়ে বলে, 'মহাশয়, আমি একজন চোর। চুরি করেই জীবিকা নির্বাহ করি। আমার মত লোকের পক্ষে কি যোগশিক্ষা সম্ভব?' সেই যোগী চোরের সত্য কথায় বিস্মিত হয়ে সংক্ষেপে বললেন, 'অবশ্যই পার। সকলেই যোগশিক্ষার অধিকারী।' এবার চোরের অবাক হবার পালা। সে বলল, 'কিন্তু ইতোপূর্বে আমাকে অনেকে বলেছেন যে আগে চুরি করা বন্ধ না করলে যোগ শেখা যাবে না–' এবারে যোগী একটু হেসে বললেন, 'তোমার মধ্যে জ্ঞানের আলো নেই তাই অজ্ঞানের অন্ধকারে তুমি চুরি করতে পারছ। অন্ধকারের সাথে সরাসরি লড়াই করা যায় না। যোগের আলো তোমার মধ্যে প্রবেশ করতে দাও তাহলে আর কোন অন্ধকার থাকবে না। সেই দিব্য আলোতে চুরি কেন, কোন অন্যায় কাজই করতে পারবে না। তোমার অন্তরের আলোই তোমাকে সঠিক পথ দেখাবে।'

সূর্যের কিরণ যেমন স্থান কাল পাত্র বিবেচনা না করে সর্বত্র সমানভাবে আলোকিত করে তেমনি যোগের আলো আমাদের অন্তর এবং বাহিরকে যুগপৎ উদ্ভাসিত করে তোলে। একটি গাড়ি ঠিকমত চালানোর জন্য যেমন উপযুক্ত একটি পরিবহন যন্ত্র, জ্বালানি বা শক্তির যোগান এবং দক্ষ চালকের প্রয়োজন তেমনি আমাদের পার্থিব জীবনপ্রবাহেও একটি নীরোগ শরীর, অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্য এবং পরিশীলিত মনের একান্ত প্রয়োজন। যোগ এই দেহ, প্রাণ এবং মনের ভারসাম্য বজায় রেখে আমাদের সুস্থ এবং সৃষ্টিশীল রাখে। আমাদের সবরকম রোগের মূল কারণ প্রতিরোধ ক্ষমতার স্বল্পতা এবং স্ট্রেস। যোগ আমাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা পর্যাপ্ত করে এবং সর্বতোভাবে স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।

আমাদের দেহমনের সর্বাঙ্গীণ নিয়ন্ত্রণ মূলত প্রাণের পাঁচরকম কাজের উপর নির্ভরশীল এবং এগুলি আমাদের জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আপনাআপনি হ তে থাকে। শ্বাসপ্শ্বাস, রক্তসঞ্চালন, হজমক্রিয়া, সংগ্রহণ এবং রেচনক্রিয়া বিভিন্ন বায়ুর সাহায্যে ঘটে থাকে এবং এদের কোন একটির সামান্য বৈকল্যে শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যহানি ঘটে। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান এবিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নয় কিন্তু যোগীরা প্রাচীন কাল থেকেই এগুলি নিয়ন্ত্রণের দ্বারা রোগ নিরাময় করতে জানতেন।

সমস্ত দিন সব সময় আমাদের মনে নানারকম চিন্তার উদয় হতে থাকে যার সম্বন্ধে আমরা সচেতনভাবে অবহিত থাকি না। এই সব বাজে লাগামহীন চিন্তা স্রোতের ফলে আমাদের মানসিক শক্তির অপচয় হয়, একাগ্রতা বিনষ্ট হয়। যোগ আমাদের সবসময় মনোযোগী থাকতে শেখায় এবং বাজে চিন্তা নিয়ন্ত্রণে এনে একাগ্রতা বাড়ায়। একাগ্র মনই সমস্ত ক্ষমতা ও সৃষ্টিশীলতার উৎস। আজকাল আমরা মানবসম্পদ উন্নতির কথা বলে থাকি। যোগের মাধ্যমে শারীরিক এবং মানসিক উন্নতির দ্বারা মানবসম্পদের যথাযথ প্রয়োগ এবং প্রসারণ ঘটে যা ব্যক্তি, জাতি এবং দেশের পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর।

যোগ মানুষের চেতনার সীমাহীন প্রসার ঘটায় যার ফলে মনের

অন্ধকার দূর হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নৈতিক জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হয়। এর অনিবার্য ফলস্বরূপ আমরা সহজেই স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণ করে, সবসময়ে মানসিক ভারসাম্য বজায় রেখে বেঁচে থাকার নতুন মাত্রা খুঁজে পাই। জীবনের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়। জীবন প্রকৃত আনন্দময় হয়ে ওঠে।

সাধারণত আমরা উৎকট অহংবোধের শিকার হয়ে আমাদের কর্মজীবন এবং নশ্বর পার্থিব সঞ্চয়সমূহকেই জীবন বলে ভেবে বসি। কর্মজীবন এবং বিষয়সম্পত্তি জীবনের ক্রমবর্ধমান পরিধিমাত্র। এর কেন্দ্রবিন্দুতে আছে আমাদের আসল অবস্থান বা সত্তা, যা সদা অঞ্চল, অবিকৃত এবং অপরিণামশীল। জীবনবৃত্তের পরিধি এই সদাস্থির কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এই কেন্দ্র সম্পূর্ণভাবে পরিধিনিরপেক্ষ থাকতে পারে। যোগ আমাদের জীবনকে স্থির কেন্দ্রাভিমুখী করে তোলে যার ফলে আমরা সঠিক পথ এবং কর্মনির্দেশ অন্তর থেকেই পেয়ে থাকি এবং জীবনের পরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হই।

যোগের জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যর কথা অনেকটা বলা হল। এবার দেখা যাক যোগ মানে কী। যোগ শব্দটি সংস্কৃত 'যুজ্' ধাতু থেকে উদ্ভূত যার মানে যুক্ত করা। যোগ আমাদের শরীর মন প্রাণকে অন্তহীন উৎসের সঙ্গে যুক্ত করে যার উপলব্ধি করে রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন, 'আমারে তুমি অশেষ করেছ।'

এ ছাড়া যোগ আমাদের সব রকম অবস্থায় সমতা রক্ষা করায়– ভালমন্দ, লাভক্ষতি, জয়পরাজয় সমানভাবে গ্রহণ করতে শেখায়। তাই *গীতায়* বলা হয়েছে, 'সমত্বং যোগ উচ্যতে,' যেহেতু যোগের মাধ্যমে সমস্ত কাজে কুশলতা আসে তাই *গীতায়* আরও বলা হয়েছে, 'যোগ কর্মসু কৌশলম।' তবে যোগের সবচেয়ে বড় সংজ্ঞা পাওয়া যায় মহর্ষি পতঞ্জলির যোগসূত্রে– 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।' আমাদের চিত্ত সবসময়ে প্রমাণ, বিকল্প, বিপর্যয়, নিদ্রা ও স্মৃতি এই পাঁচটি বৃত্তির মধ্যে ঘোরাফেরা করে। এই বৃত্তিগুলির সমূহ নিরোধ হলে আমরা মনশূন্যতায় অবস্থান করি। সেটাই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ– 'তদা দ্রষ্টুঃস্বরূপে অবস্থানম।' সুতরাং সেই চরম মনশূন্যতায় উত্তরণ করাই যোগের পরম লক্ষ্য। তখন আমরা দেহমনের সুদূর পারে নিজেকে হারিয়ে সমগ্র বিশ্বচেতনার সঙ্গে একাত্ম বোধ করি।

স্বাভাবিকভাবেই যোগ নানা প্রকারের এবং অধিকারী ভেদে আমাদের যোগের পথও আলাদা হতে পারে। যেহেতু আমাদের সকলেরই একটি স্বাস্থ্যবান, নীরোগ শরীরের প্রয়োজন তাই প্রারম্ভিক যোগ হল হঠযোগ। এটি আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম ও বন্ধের অভ্যাসের ফলে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখে এবং নানারকম দুরারোগ্য রোগও নিরাময় করে। রোগপ্রতিরোধ, নিরাময় এবং সুস্বাস্থ্য বজায় রাখাই হঠযোগের লক্ষ্য, তাই এটিকে রাজযোগের ঐচ্ছিক সোপান বলে গণ্য করা হয়। অবশ্য হঠযোগ ছাড়াও রাজযোগের সার্থক অভ্যাস করা যায়। রাজযোগ মূলত মানসিক এবং অন্তঃপ্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আনে। যেহেতু এটি অতিদ্রুত ফলদায়ী এবং প্রত্যক্ষ পথ, তাই এটিকে রাজযোগের মর্যাদা দেওয়া হয়। এটি অষ্টাঙ্গযোগের পথ যথা– যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি।

এছাড়া আমরা নিয়ত আত্মানুসন্ধানের মধ্য দিয়েও যোগের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি। এটি বিচারধর্মী এবং জ্ঞানযোগের পথ। যাঁরা স্বভাবতই ভক্তিপ্রবণ, ধার্মিক এবং ঈশ্বরবিশ্বাসী তাঁদের জন্যে সহজপথ ভক্তিযোগের মাধ্যমে ঈশ্বরে সমস্ত কিছু মানসিকভাবে সমর্পণ করা। তখন আমাদের ব্যক্তিগত সুখদুঃখ, ভালমন্দ এবং কামনাবাসনার নিরসন ঘটে। কবি গেয়েছেন, 'তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ আমার জীবন মাঝে।' জীবন তখন পাল তোলা নৌকার মত অনায়াসে ঈশ্বরনির্ভর হয়ে এগিয়ে চলে।

যদি আমরা ব্যক্তিগত লাভালাভের হিসাব না করে সুষ্ঠুভাবে নিজের কাজ করে যাই এবং নিজেকে মানবকল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে নিয়োজিত রাখি তাহলে সেটি হবে কর্মযোগের পথ যা সবসময়ে কঠিন। তবে প্রকৃতি এবং রুচিভেদে আমরা যে যোগপথই অবলম্বন করি না কেন উপরিউক্ত পথগুলি একে অন্যের পরিপূরক এবং এদের মধ্যে কোন বিরোধিতা নেই এবং একটি যোগের নিষ্ঠাসম্পন্ন অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে যোগের অন্য পথগুলিরও সমন্বয় ঘটে থাকে।

যোগের সবচেয়ে বড় ফল হল সর্ববিধ দুঃখের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন, আমাদের সমুদয় দুঃখের কারণ পাঁচটি– অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। প্রকৃত জ্ঞানের অভাব, অহংবোধে আবদ্ধ থাকা, নানা বিষয়ে আসক্তি বা বিদ্বেষ এবং মৃত্যুভয় আমাদের দুঃখ দেয়। এগুলি জয় করতে না পারলে প্রকৃত আনন্দ বা শান্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। এগুলি সম্যকভাবে দূর করার সার্থক উপায় হচ্ছে যোগ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যোগের দ্বারা আমাদের দেহমন সুস্থ ও নীরোগ থাকে, মানসিক ক্ষমতার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ হয়, জীবন একটি সুষম ছন্দে ও আনন্দে ভরপুর হয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যপথে এগোতে থাকে। তাই আমরা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গাই– 'যুক্ত কর হে যোগের সঙ্গে মুক্ত কর হে বন্ধ, সঞ্চার কর সকল কর্মে শান্ত তোমার ছন্দ।'

মথুরানাথ কুণ্ডু ভারতের প্রাবন্ধিক, যোগ চর্চাকারী

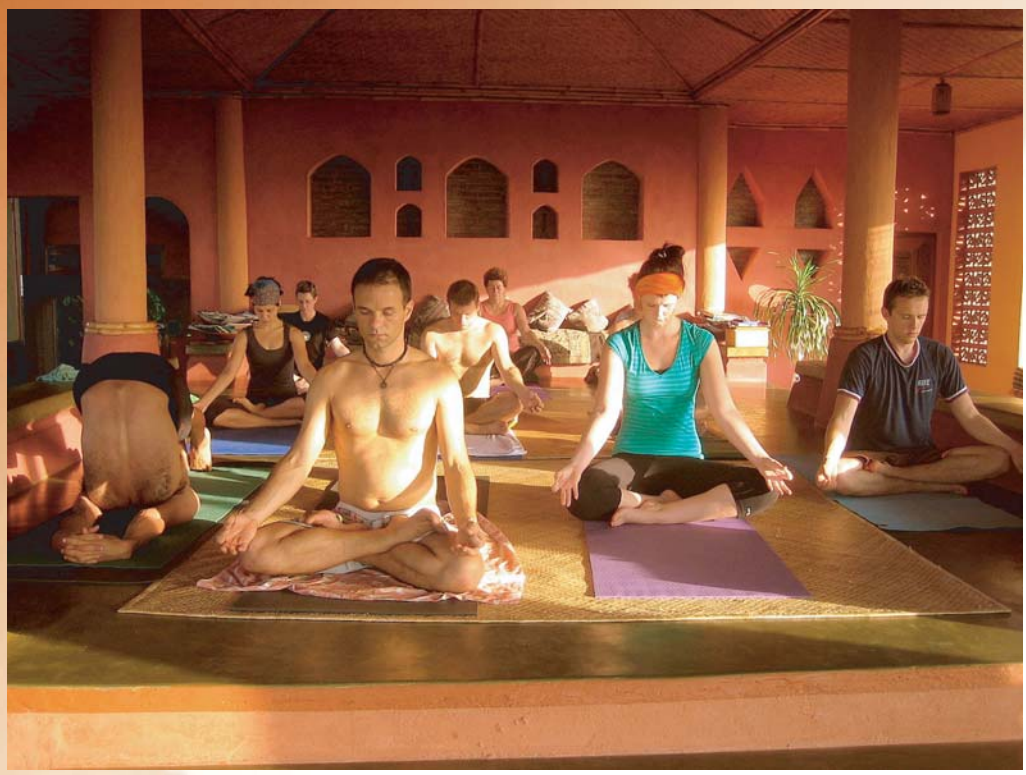

প্রচ্ছদ রচনা

আসুন যোগ অনুশীলন করি

বিরদ রাজারাম যাজ্ঞিক

পৃথিবীর সর্বত্র আজ যোগ অনুশীলিত হয়ে থাকে। ভারতীয় পুরাণ ও প্রাচীন পুঁথিপত্রে যোগের মূল নিহিত হলেও আজ আধুনিক বিশ্বের প্রতিটি জাতি ও সমাজের জীবনে যোগ ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে। বিশ্বের প্রতিটি ভাষায় এখন যোগ-সাহিত্য পাওয়া যায় এবং এটি বৈশ্বিক স্বাস্থ্য ও কুশল-শিল্পের এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে।

আমার যোগ-যাত্রা শুরু হয়েছিল ব্যাংককের হেরিটেজ হোটেল *নেই লের্ত পার্ক*-এ, এর প্রতিষ্ঠাতা নেই লের্ত-এর পরিবেশ, প্রকৃতি ও এর সংরক্ষণ সংক্রান্ত দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হতে গিয়ে। হোটেলের ব্যবস্থাপনা পরিচালিকা নাফা পোর্ন বদিরত্নংকুরা (লেক) লের্ত-এর প্রোপৌত্রী। নাফা পোর্ন ব্যাংককের যোগ অনুশীলন কেন্দ্রগুলির সমন্বয়ক এবং একজন শুদ্ধ যোগ অনুশীলনকারিণী। প্রাগ্রসর যোগাসন অনুশীলনরত লেক-এর বিভিন্ন আলোকচিত্র দেখে আমি অনুধাবন করলাম যে, শিগগিরই বিশ্বে আধুনিক যোগ প্রবর্তিত হতে যাচ্ছে। তাঁর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর গোপন কথা হচ্ছে সুখাদ্য, সুনিদ্রা আর দৈনিক যোগানুশীলন। শুনলে বিস্মিত হতে হয়, বর্তমান যোগ ব্যবসায়ে বিশ্বব্যাপী ২ হাজার ৭শো কোটি ডলার লগ্নি হয়েছে। এই অর্থ যোগের অনুশীলন, প্রকাশনা ও যোগ-সংক্রান্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যয়িত হচ্ছে। অনুশীলন হচ্ছে যোগের মূল শক্তি, প্রকাশনা হচ্ছে জ্ঞানশক্তি আর পণ্য হচ্ছে ব্যবসায় শক্তি। এই তিন শক্তিই পরপর নির্ভরশীল এবং একটি শক্তিশালী যোগের পরিবেশ সৃষ্টিতে এই তিনের সমন্বয় অপরিহার্য।

উপরোক্ত তিন শক্তির প্রথমটি হচ্ছে বিক্রম যোগ। বিক্রম যোগ অনুশীলনের জন্য সারা বিশ্বে পাঁচ হাজারের অধিক যোগানুশীলন কেন্দ্র রয়েছে; ১৯৭৫ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক *ইয়োগা জার্নাল* প্রকাশিত হচ্ছে এবং এর পাঠক সংখ্যা ১৩ লাখ; যোগের পোশাক-সংক্রান্ত বিশ্বব্যাপী চেইন শপ লুলু লেমন। যোগ পণ্যখাতে ব্যয় হচ্ছে ১শো ৩০ কোটি ডলার।

একটি শক্তিশালী যোগ ব্র্যান্ড তৈরি করতে আপনার প্রয়োজন হবে সঠিক পরিবেশ, যা কিনা যোগের ব্যবসায় সুরক্ষা করবে। যোগের মূল উৎপত্তি হাজার হাজার বছর আগে হলেও আধুনিককালের ব্র্যান্ড যোগের জন্যে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সুরক্ষা একান্ত অত্যাবশ্যক।

যোগ আজ বিশ্বব্যাপী যে পদচিহ্ন রাখতে পারছে, তার অন্যতম কারণ হচ্ছে সময়, অঞ্চল ও সমাজের সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবর্তনের ক্ষমতা। যোগ খুবই নমনীয়– শুধু আসনের ক্ষেত্রে নয়, পরিবেশের ক্ষেত্রেও। আজকের দিনের ব্যবসায়িক পরিবেশের জন্য চাই উদ্ভাবন, গবেষণা এবং যোগ-পণ্য উৎপাদনে প্রণোদনা যা হবে কপি রাইট আইনের মাধ্যমে সুরক্ষিত। শুধুমাত্র তখনই ব্যবসায়ের আইন ব্র্যান্ড যোগের জন্যে সুফল বয়ে আনতে পারবে।

ব্র্যান্ড যোগ হচ্ছে একটি উপহার– বিশ্ব যা পর্যবেক্ষণ করেছে। কুশলতা ও স্বাস্থ্য শিল্পের নেতৃত্বদানে এর শক্তিমত্তা অপরিসীম। বিশ্বকে অধিকতর সমৃদ্ধ করতে হাজার হাজার লোক এ কাজে নিয়োজিত হতে পারেন। তবে আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখা থেকে বিরত থাকুন, যোগ কেবলই অনুশীলনের বিষয়, অতীতে যেমন ছিল। যে কোন ধরনের পরিবর্তন একে লঘু করে ফেলবে। যোগ আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং এই আবিষ্কারের ফলে এটি ব্যাপক গণভিত্তি পেয়েছে। যে কোন ধরনের গোঁড়ামি এর প্রসারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। আসুন আমরা সবাই একবিংশ শতাব্দীর ব্যান্ড যোগ সৃষ্টিতে বর্তমান ব্র্যান্ড ও ব্যবসায়িক পরিবেশকে স্বাগত জানাই।

বিরদ রাজারাম যাজ্ঞিক তাত্ত্বিক, যোগসাধক

বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতি

হোমটাউন প্রজেক্ট, লেভেল # ১৬, সুট # ১৫বি
৮৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
E-mail: info@bifs.org.bd
b_ifs@yahoo.com
(জিপিও বক্স # ৭৭৫)
ওয়েবসাইট: www.bifs.org.bd

ABSSI
Association of Bangladeshi Students Studied in India

ভারতে উচ্চশিক্ষা লাভকারী শিক্ষার্থী সমিতি
President: Dr. Dalem Chandra Barman
VC, ASA University, Dhaka
Phone: 01552 334300
Secretary: Shamim Al-Mamun
Phone: 01715 902146

নতুন
HARPIC
ALL IN 1
ট্রাই করেছেন কি?
কঠিনতম দাগ দূর করে
৯৯.৯% জীবাণু ধ্বংস করে
দূর্গন্ধ দূর করে
HARPIC
POWER PLUS
ALL IN 1

প্রচ্ছদ রচনা

বাংলাদেশে যোগের উৎপত্তি ও বিকাশ

মোহাম্মদ হারুন

আজকের দিনে যোগ একটি জনপ্রিয় ও সমগ্র বিশ্বে স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত চর্চা হিসেবে সমাদৃত। প্রাচীনকালে এটি দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ হিসেবে মুনিঋষিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও আজ এটি সর্বব্যাপ্ত হয়ে সর্বসাধারণের চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতীতে ভারতে এর উৎপত্তি হলেও বর্তমানে যোগ সারাবিশ্বে অধীত ও চর্চিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশে যোগানুশীলনের ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। বিগত শতাব্দীর ৮০-র দশকের প্রথম দিকে ড. আশরাফি বাংলাদেশ টেলিভিশনে যোগ প্রবর্তন ও উপস্থাপন করেন এবং প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। সময়ের বিবর্তনে ধীরে ধীরে *সিলভা মেথড, যোগ ফাউন্ডেশন*-এর মত অনেক যোগ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এসব প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে সাফল্যের সঙ্গে যোগের বিস্তার ঘটিয়েছে।

যোগের জনপ্রিয়তা সারাবিশ্বে যেমন বাড়ছে, তেমনি এর অনুশীলনের বৈচিত্র্যও বাড়ছে– যেমন শারীরিক সক্ষমতার জন্যে যোগ, স্বাস্থ্যের জন্য যোগ, যোগ-থেরাপি, খেলাধূলার জন্য যোগ, সৌন্দর্য বর্ধনের জন্যে যোগ, ভাল ফলের জন্য যোগ ইত্যাদি ইত্যাদি। এসবেরই সূত্র ধরে ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশে *বাংলাদেশ যোগ সমিতি* নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। বর্তমান লেখক এটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মনোনীত হন। ২০০৪ সালে এটি *আন্তর্জাতিক যোগ সমিতি*র অনুমোদন লাভ করে। ২০১০ সালে *এশীয় যোগ সমিতি* গঠিত হলে বাংলাদেশ এর সদস্যপদ লাভ করে এবং বর্তমান লেখক এর যুগ্ম-সম্পাদকের দায়িত্বভার লাভ করেন।

যোগানুশীলনের মাধ্যমে দেশের বিশেষত দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের শারীরিক সক্ষমতা ও মানসিক প্রশান্তির জন্যে তাদের উদ্বুদ্ধ করে একটি সুন্দর জাতি নির্মাণ এই সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বান্দরবান পার্বত্য জেলাসহ কক্সবাজার, সিলেট, রাজশাহী প্রভৃতি এলাকায় যোগ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। ২০০৯ সাল থেকে দেশের প্রধান এবং বৃহত্তম শিক্ষায়তন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ প্রশিক্ষণ কর্মকা- শুরু হয়। বাংলাদেশ যোগ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে বর্তমান লেখক ও সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক নাজনীন সুলতানা এ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এছাড়াও ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যোগবিষয়ক সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়। একইভাবে বর্তমান লেখক ও নাজনীন সুলতানা স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যায়নে যোগের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা তুলে ধরে বাংলাদেশ টেলিভিশন, এটিএন, আরটিভি, বৈশাখী টিভি, বাংলাভিশন, চ্যানেলআই প্রভৃতি টিভি চ্যানেলে নানা অনুষ্ঠান করেছেন। একইসঙ্গে মুদ্রণ মাধ্যমে যোগবিষয়ে প্রভূত লেখালেখি হয়েছে। আবার প্রতিবছর 'বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস', 'বিশ্ব হৃৎপি- দিবস', বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস'এর বিভিন্ন সেমিনার ও কর্মশালায় যোগবিষয়ক কর্মকা- প্রচারিত হয়। ২০১২ সালে দেশে প্রথমবারের মত খেলাধূলার একটি ইভেন্ট হিসেবে যোগকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি 'যোগ প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত হয়। এবছর দ্বিতীয় জাতীয় যোগ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এখানে বলা প্রয়োজন, বিশ্ব যোগ চ্যাম্পিয়নশিপ, আন্তর্জাতিক যোগ চ্যাম্পিয়নশিপ, এশীয় যোগ চ্যাম্পিয়নশিপ প্রভৃতি নামে অনুরূপ অনেক আন্তর্জাতিক যোগ প্রতিযোগিতাও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এদেশের

প্রতিটি মানুষের কাছে যোগ সম্পর্কে সচেতনতা ও আগ্রহ সৃষ্টিতে *বাংলাদেশ যোগ সমিতি* নিরন্তর কাজ করে চলেছে। এছাড়াও যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে যোগচর্চা প্রসারে নিয়োজিত রয়েছেন তাঁদের মধ্যে নাজনীন সুলতানার নাম আগেই উলেখ করেছি। আরো আছেন শামীম মাহবুব (যাত্রাবাড়ি), ভাস্কর রাসা সেলিম (ধানমন্ডি), আফসানা (রাজশাহী), উল্কা (বান্দরবান) মুন্নি, সাইদুর রহমান, লুবিয়ানা আহমেদ। ভারতের সত্যজিৎ রায় ২০০৬ সাল থেকে বাংলাদেশে যোগানুশীলনের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছেন। আমার বিশ্বাস তাঁর প্রশিক্ষণ এ দেশের যোগ শিক্ষা ও চর্চায় একান্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

মোহাম্মদ হারুন
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বাংলাদেশ যোগ সমিতি
যুগ্মস স্পাদক এশীয় যোগ ফাউন্ডেশন

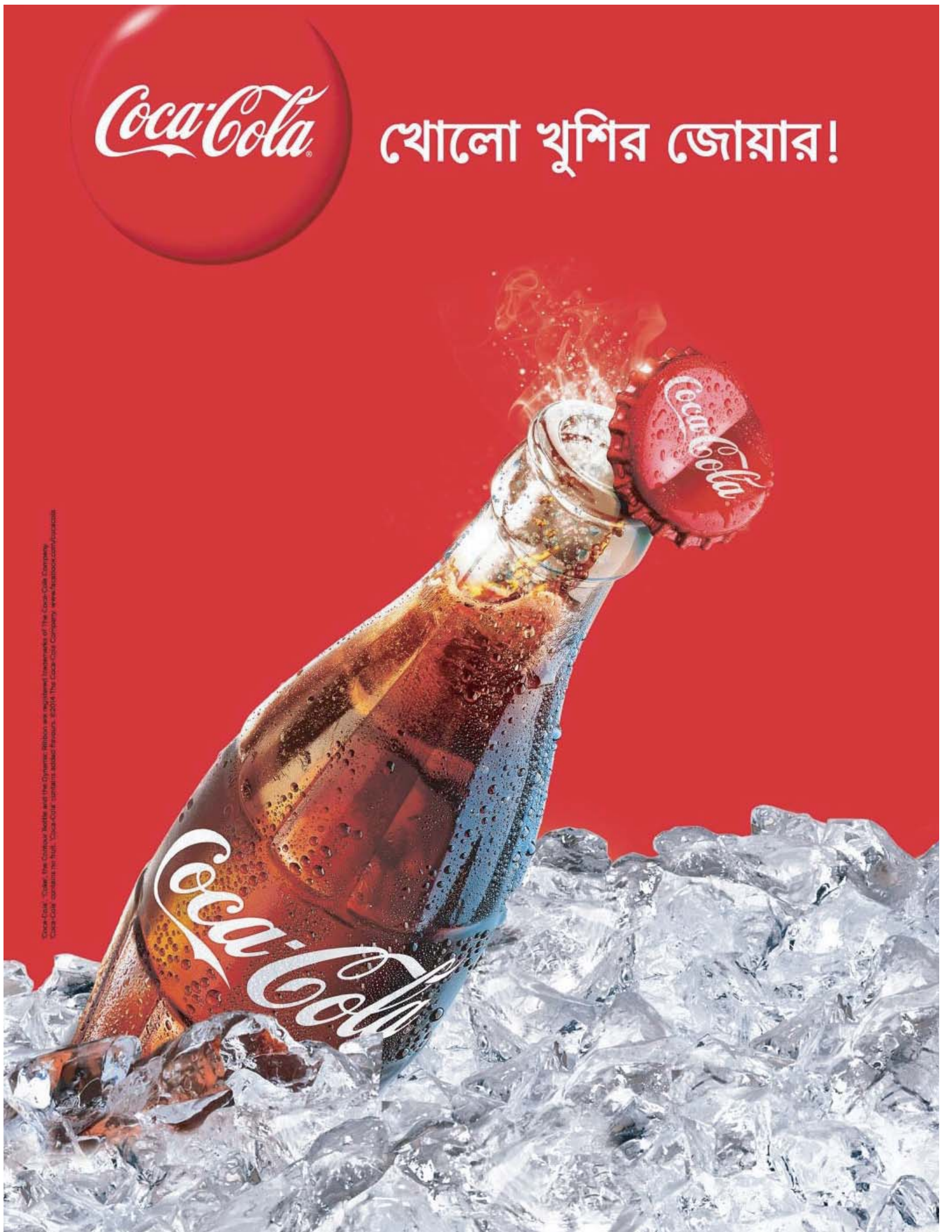
Coca-Cola
খোলো খুশির জোয়ার!
Coca-Cola
Coca-Cola
Coca-Cola, Coke, the Contour Bottle and the Dynamic Ribbon are registered trademarks of The Coca-Cola Company.
Coca-Cola contains no fruit. Coca-Cola contains added flavours. ©2014 The Coca-Cola Company www.facebook.com/cocacola

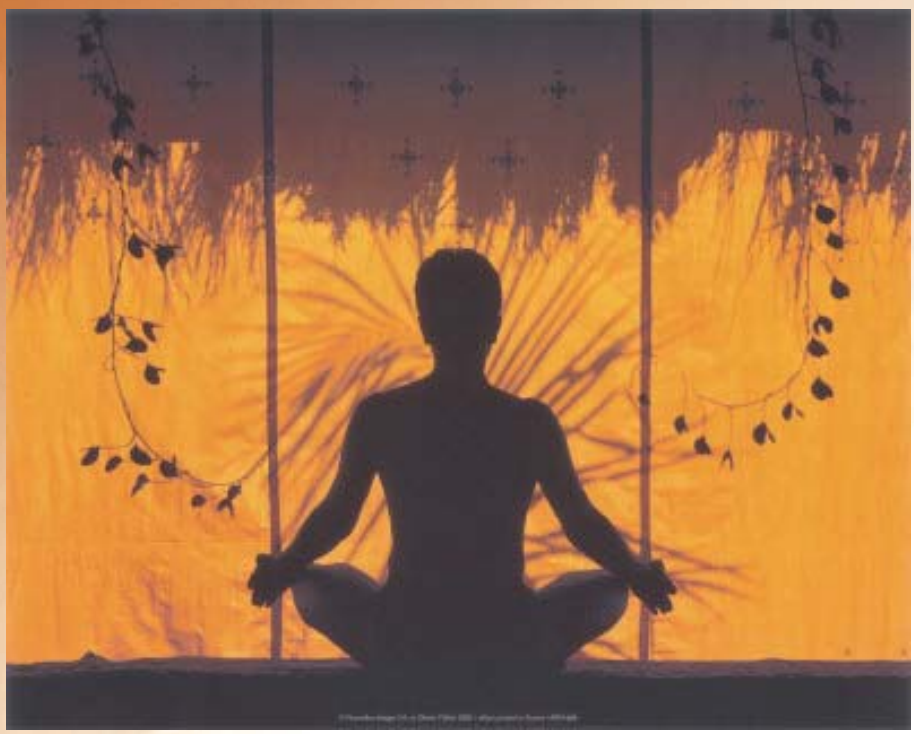

প্রচ্ছদ রচনা

মানব কল্যাণ, স্বাস্থ্য, শারীরিক সক্ষমতা ও থেরাপির জন্যে যোগানুশীলন

গুরুজী শ্রী সত্যজিৎ রায়

যোগ হচ্ছে মানবতার জন্যে এক পূর্ণাঙ্গ বাণী। এর মধ্যে মানবশরীরের জন্যে কল্যাণের বাণী নিহিত আছে। স্বামী কুবলানন্দজী বলেছেন, 'যোগের মধ্যে মানুষের মনের জন্যে যেমন বার্তা আছে, তেমনি আছে মানবাত্মার জন্যে।' যোগ শুধু একটি শারীরিক কসরত নয়, যোগ হচ্ছে এক পূর্ণাঙ্গ জীবনচর্চা। যোগ মানুষকে যে-কোন প্রতিকূল পরিবেশে স্বাস্থ্যপ্রদভাবে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। সম্প্রীতি ও আনন্দের সঙ্গে বাঁচা জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যোগানুশীলনের মধ্যে বিভিন্ন শারীরিক অনুশীলন যেমন আসন, মুদ্রা, বন্ধ, ক্রিয়া ও প্রাণায়াম অন্তর্ভুক্ত। পাশাপাশি আছে যম ও নিয়মের অনুশীলন। এই সব নিয়মকানুন মানুষের জীবনকে সুসংহত ও সুবিন্যস্ত করে যার মাধ্যমে ধ্যান সাধনার সাহায্যে একজন মানুষ মনন ও চিন্তনের জগতে প্রবেশাধিকার লাভ করে। এর মাধ্যমেই মানুষ তার প্রকৃতি সম্পর্কে সত্য-উপলব্ধিতে পৌঁছয়– এটিই হচ্ছে যোগের প্রকৃত লক্ষ্য।

যোগ থেরাপি

শরীর ও মন উভয়েরই স্বাস্থ্য রক্ষা, স্বাস্থ্য বৃদ্ধি এবং রোগ প্রতিরোধে যোগানুশীলন অতীব উপকারী, একথা উপরের আলোচনায় ফুটে উঠেছে। যোগানুশীলন ক্রনিক ঠাণ্ডা, ব্রোঙ্কিয়াল এ্যাজমা, হাইপার-টেনশন, ঘুমের অনিয়ম, ক্রনিক রোগের মত অসুস্থতার চিকিৎসার পক্ষে উপকারী। এটি মেয়েদের স্বাস্থ্য, অনভিপ্রেত মেদ ঝরানো ও মানসিক প্রশান্তির মত কাজেও ফলদায়ক। এসব অনুশীলন গোটা শারীরীব্যবস্থা যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস, কার্ডিওভাস্কুলার, হজম ও রেচনক্রিয়া ও কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ওপর সমান ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

যোগানুশীলন শিক্ষা

চোখ বন্ধ করে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করতে পদ্মাসন বা যে-কোন যোগাসনে প্রার্থনায় বসে প্রতিদিনের যোগ পাঠদান শুরু হয়। যোগক্রিয়া সম্পর্কে মৌখিক নির্দেশনাদানের মাধ্যমে সূচিত ক্লাশে ক্রমে বিভিন্ন আসন ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড (যেমন ক্রিয়া, মুদ্রা, প্রাণায়াম ও বন্দ)-এর প্রদর্শন চলতে থাকে।

সুবিধা-অসুবিধা

বিভিন্ন রোগে স্বতন্ত্র অনুশীলন, দলগত অনুশীলন ও বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন। প্রশ্নোত্তরপর্বে শিক্ষার্থী বা রোগীদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত প্রশ্ন করতে উদ্বুদ্ধ করা হয় এবং তাদের সন্দেহ নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। কোন গবেষণামূলক কাজ হলে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এক মিনিট নীরবে বসে শিক্ষার্থী ও রোগীদের শরীর-মনে শিথিলতা নেমে আসার পর প্রার্থনা শেষে ক্লাশের পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়। তারপর পরবর্তী দিনের কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়।

যোগের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ

১. যোগানুশীলন

শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম, সূর্য প্রণাম।

২. আসন

আসনের শ্রেণিবিন্যাস দুই ধরনের– ধ্যানমূলক ও সাংস্কৃতিক। সাংস্কৃতিকের আবার উপবিভাগ রয়েছে যেমন পুনরাবস্থিতি। পুনরাবস্থিতি আসনে শ্রান্তি বা অবসাদ দূর হয়।

(ক) ধ্যানাসন: পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, বজ্রাসন (চেয়ারে বসেও আসনগুলি করা যায়)

(খ) পুনরাবস্থিতি আসন: শবাসন, মকরাসন (চেয়ারে বসেও আসনগুলি করা হয়)

চিৎ হয়ে শুয়ে

(গ) শারীরিক আসন –

১. পবন মুক্তাসন

২. মেরুদণ্ডাসন ও অন্যান্য আসন

উপুড় হয়ে শুয়ে

১. ভুজঙ্গাসন

২. শলভাসন ও অন্যান্য আসন

বসার আসন

১. জানুশিরাসন

২. উষ্ট্রাসন ও অন্যান্য আসন

দাঁড়ানো আসন

১. পাশে বেঁকে চক্রাসন

২. তাড়াসন বা তালাসন ও অন্যান্য আসন।

৩. প্রাণয়াম: বিভিন্ন প্রকারের শ্বাস-প্রশ্বাস

গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ ও নিশ্বাস ত্যাগ শরীরের সুস্থতা ও পরিচর্যায় সাহায্য করে। আপনি যদি জোরে শ্বাস নেন, শরীরে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন ঢোকে– শরীরের প্রতিটি কোষ তাতে উজ্জীবিত হয়। আর যখন নিশ্বাস ত্যাগ করেন– অনুলোম-বিলোম, উজ্জয়ীর মাধ্যমে বর্জ্য পদার্থ বেরিয়ে যায়।

৪. বন্ধ ও মুদ্রা

মুদ্রা হচ্ছে অতিমাত্রায় সক্রিয় 'সমাবেশ' যা কিনা একই সঙ্গে অন্তঃস্থ ও বহিঃস্থ। একেই মুদ্রা নামে অভিহিত করা হয়। প্রাণায়ামের কৌশল হিসেবে যে-সব মুদ্রা অনুশীলিত হয়, তাকে আমরা বন্ধ (উদ্দীয়ন বন্ধ, জিহ্বা বন্ধ, মূল বন্ধ) নামে আখ্যায়িত করে থাকি।

৫. ক্রিয়া

শরীরের শুদ্ধতা মনের শুদ্ধতা আনয়ন করে। এ জন্যে যোগীরা ৬ ধরনের শুদ্ধিকরণ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। এর নাম 'শোধন ক্রিয়া' বা পরিচ্ছন্নতা পদ্ধতি– শারীরিক শুদ্ধতার জন্যে এটি একান্ত অত্যাবশ্যকীয় কর্ম।

৬. ধ্যান

যে-কোন যানবাহনের জন্যে যেমন বুদ্ধিমান চালক প্রয়োজন, তেমনি শরীরের প্রয়োজন একটি ভারসাম্যপূর্ণ মন যা কিনা আপনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে। নিয়মিত ধ্যান এমন মন অর্জনে আপনাকে সাহায্য করবে। এর ফলে স্বচ্ছ ও আলোকিত হবেন এবং আপনার মনঃসংযোগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

৭. শান্তিপথ

শান্তি মন্ত্রোচ্চারণ–

'ঈশ্বর আমাদের সকলকে রক্ষা করুন
তিনি আমাদের গ্রহণ করুন
প্রাণশক্তি দিয়ে আমাদের পালন করুন
আমাদের জ্ঞান উজ্জ্বল আলো ছড়াক
আমাদের ভিতর যেন কোন বিভেদ না থাকে ॥'
[সংস্কৃত মন্ত্রের বঙ্গানুবাদ]

গুরুজী শ্রী সত্যজিৎ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পতঞ্জলি যোগ, আয়ুর্বেদ এন্ড নেচারোপ্যাথি লি.

Saffola Active

Introducing new 'Saffola Active', blended edible vegetable oil. It brings you the benefits of 2 oils (80% Rice Bran & 20% Soyabean) in one. Saffola Active is more effective for heart than any other ordinary vegetable oil. And it promises you healthy heart and healthy life.

3 Triple Action — Omega3, Vitamin E, Oryzanol

Saffola Active is enriched with **Triple Action Formula** that contains the goodness of Omega 3, Oryzanol and Vitamin E which help to reduce LDL (bad cholesterol) levels.

LOSORB™ TECHNOLOGY

Saffola Active comes with patented **LOSORB technology**. Foods cooked in Saffola Active have lower fats due to lower absorption of oils while cooking.

5 Antioxidant

Saffola Active also has the **goodness of 5 antioxidants** which keeps your heart and life healthy.

So, start using Saffola Active from today and keep your family healthy and always rejuvenized. Available in 1 litre and 5 litres jars.

marico

Healthy Heart
Healthy Life

সমস্ত পৃথিবীর সংবাদপত্র নিষিদ্ধ হলে জঙ্গীরা তখন কী করবে

তাপস রায়

তবে হে সুন্দর, এই মার্ভেলাস নিষ্ঠুরতা
তোমাকে মানিয়ে যাচ্ছে বলে
নিউজপেপার কাটতির দিকে তাকিয়ে
প্রতিটি সকালে ওই অপলক
থমকানো আগুন কতদূর গড়িয়ে দিতে চাইবে! বল
নামতে নামতে, প্রেতচর ওই নামার ভেতরে
পায়ে এমন গতি, দাঁড়াতে পারছ না আর

খোয়াড়ের ভেতর আমি নিষিদ্ধ মানুষ
যদি হিন্দু ত্মহি ন্দু করে আজন্মের
ওই চকচকে ছুরিটিকে বয়ে নিতে বেয়াদবি করি
তুমি তো মোড়া দেবে না
বড়জোর কসাইখানার দিকে ঠেলে দেবে উপন্যাসসহ
তাতে দু'এক কলাম অশ্রুও হতে পারে

ভাল লাগছিল না, মানে ফ্ল্যাটবাড়ি ছটফট করছে ভেতরে
ডিসেম্বর থেকে তুলে নিয়ে আমি চাইছিলাম
এই কমলালেবুর শীত্ব বেঞ্চের উপরে এসে বসুক
আর বাচ্চারা যেন আন্দাজ করে
শালপাতায় হাতে হাতে উঠে আসবে তাদের জন্য রাখা
থই থই আনন্দ, তারা যেন টের পায়
দুই হাতের পাশ দিয়ে গজিয়ে উঠছে
প্রজাপতিদের মত রংবাহার আশ্চর্য ফুরফুরে ডানা

আমাকে এটুকু চাইতে দাও–
বাচ্চারা যেন বিশ্বাস না করে পৃথিবী মানে
স্কুল ইউনিফর্মে দলাদলা রক্তমাংসের হাহাকার

তাপস রায় ভারতের কবি

নিঠুর কোজাগরী

সোফিয়ার রহমান

তুমি নিঠুর কোজাগরী
লাবণ্য কই তোমার?

জানলার গরাদ খুলে দেখি শেষরাতে
পৃথিবীর পাতে ঝরে পড়ছে রিক্ত মানুষের দীর্ঘশ্বাস
কারো কারো লক্ষ্মীলাভ, সকলের নয়

সোফিয়ার রহমান ভারতের কবি

কমলের দুঃখ ছিল না

দীপক সাহা

আমাদের ছাতা ছিল
কমলের ছাতা ছিল না
কমলের দুঃখ ছিল না
কচুপাতায় বইখাতা মু ড়ে
বৃষ্টিতে ভিজত শুধু।

বর্ষায় জ্বর হত আমাদের
কমলের জ্বর হত না।
আমাদের বাড়িতে নবান্ন
কমলের ক্ষুধাপেট; তবু
আম আঁটির ভেঁপু বাঁশি
খুব প্রিয় ছিল তার।
সুরগুলো কেমন বৃষ্টিভেজা।

কমলের কোলে ফুটফুটে মেয়ে
পাশে টুকটুকে বউ
এয়ারপোর্টে দেখা– কতদিন পর
এখনও কমলের দুঃখ নেই।

মেয়ের বায়না–
ওরা বৃষ্টি দেখতে শিলং যাচ্ছে

স্পর্শকাতরতা

প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়

সাদা কাগজে রঙতুলির আঁচ ড়ে
তোমাকে ছুঁতে চাইছি অনেকদিন পরে
তোমার কপালের বিন্দি টিপ
চুল থেকে ঝরে পড়া জল
আঁচলের সরে যাওয়া ছায়া
এই সবকিছু থেকেই তোমায় ছুঁতে চাইছি

যদিও জানি
বহুদিন হাতে তুমি মেহেন্দি কর না
এখনও নিশ্চয়ই আলগা থাকো
রান্নাঘরের সময়টুকুতে
এখনও হয়তো স্নানঘরের দেয়ালে অন্যমনস্ক
রেখে আসো মেরুন টিপ

সহজে তুমি নিজেকে বদলাতে পার না
জেদি বেড়ালের মত একরোখা
জীবনটা বারান্দায় ফেলে রেখে
মাটি আঁচড়ে সময় কাটিয়ে দিলে
চিরাচরিত ঢেউগুলো সেভাবে তোমায়
স্পর্শই করতে পারল না

প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় ভারতের কবি

জোছনারঙের গল্প

আশুতোষ ভৌমিক

ঈশানবন্দরে ধীরে ধীরে জড় হচ্ছে
মোষরাঙা মেঘেদের ডেলা
কী সুন্দর সুন্দর
নদী– ঢেউ– বালুচর
এবং বেহুলা
নির্জন নিশীথে সজীব আঁধারে
সবুজ বাগানে যায়
ত্রস্তচিত্তে খোঁজে সবুজাভ ঘ্রাণ
জোছনার প্লাবনে ভাসে জোছনাদের প্রাণ

সহসা ঘুমের ভেতর থেকে জেগে ওঠে মন
আঁধারের বুকে নাচে ঘন শশীবন

ছাতিমতলার গল্প

মাখনলাল রায়

প্রশান্তবাবুর সাথে দেখা হতেই আবার সেই
ছাতিমতলার গল্প।
'গঙ্গেচ যমুনাচৈব ....' বললেই
সেই স্নানক্ষেত্রে এসে গঙ্গাযমুনাদি
অধিষ্ঠিত হয়– কথাটার অসারতা বুঝতে পারলাম।
'শ্যামলী' নামে মাটির বাড়ির গল্প
বললেই তো আর রবীন্দ্রপদচারণাধন্য
মাটির বাড়ি দর্শন হল না।
গঙ্গাতীরশ্যামলীছাতিমতলা নিয়ে
কল্পকাহিনি সৃষ্টি অর্থহীন।
গল্পে দোতলা পুকুর সম্ভব হলেও
কল্পনার ভুরিভোজে পেট ভরার কথা নয়।
বোকা মেয়ে রোজ রাতে তার ভালবাসার মানুষের নামে
একটা করে প্রদীপ জ্বালাতেই
পেল কি তার কাঙ্ক্ষিত মানুষটিরে!
বরঞ্চ এভাবে সারাটা জীবন নিজের ভালবাসাকে
বুকে চেপে কষ্ট পেয়ে গেল।

তারপর যা হয় তাই, দম ফুরাতেই ফুস্
হাওয়ার মানুষ হাওয়ায় মিলিয়ে যায়–
পেছনে পড়ে থাকে ছাতিমতলা
আবারও তার নীচে আশ্রয় নেয় আরও কিছু মানুষ।

জলকীর্তন

মাহফুজ রিপন

মধ্যাহ্ন সূর্যের তেজ আমাকে বারবার
জলের কাছে নিয়ে যায়
পিপাসার শরীরে লোনা ধরে।
জোয়ারের আশায় মন
মাতায়, ঝাঁপায় দুনিয়ার এক প্রান্ত
থেকে অন্য প্রান্তে।

নদী নারী মৃত্তিকা জলকীর্তন করে
পিপাসাকাতর শঙ্খচিল
মেঘেদের বর্ষার গান শোনায়।

আদিম পৃথিবী থেকে জলের স্তর
নেমে গেছে সীমা থেকে শীলায়
প্রকৃতির বৈরিতায়
বিপ্রলব্ধে মধুমতি
পদ্মাবিহনে কুমার
কালের মৃত্যু ঘটে
ঘন হয়ে আসে মহাকাল।
জলমঙ্গলের আশায়
উদাসী বেহুলা আসন পাতে
অবাক বৃক্ষের তলায় ।
বৃদ্ধ সবই দেখে, মৃদু হাসে
আবার নদী হয়ে যায়।

আলাউদ্দিনের দিনকাল

ইলিয়াস বাবর

দাদুর মুখে বাঁশিওয়ালার গল্প শুনে
আলাউদ্দিনের ইচ্ছে জাগে সেও হবে বংশীবাদক
তার পেছনে ঘুরবে ইঁদুর সম্প্রদায়।

আলাউদ্দিন এখন; প্রিয় এভূমে
লেজে আগুন নিয়ে ঘুরে শহরনগরগ্রাম
আর চর্চা দিয়ে যায় লেলিহান বাঁশির সুর।

তার ইচ্ছেরা পূরণ হয় অগ্নিদগ্ধের
বিদীর্ণ অভিশাপ আর বদদোয়া...

খবরে প্রকাশ আলাউদ্দিনেরা একদিন ইঁদুর হয়ে
তলদেশ ভ্রমণে যাবে ফোরাতের!

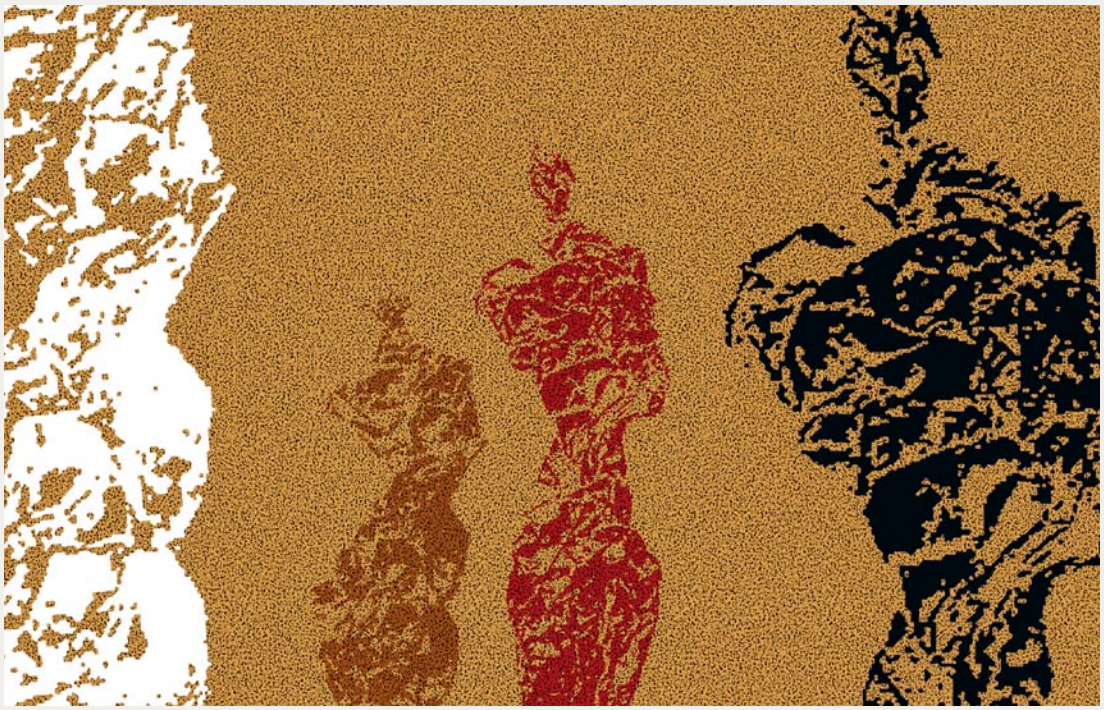

ছোটগল্প

আত্মজ্ঞান

সুব্রত মণ্ডল

পাঁচের পরে পাঁচটা শূন্য! রসগোল্লার মত ছুঁড়ে দিল। হেলদোল নেই। প্রতিক্রিয়া নেই। মুখের চামড়ায় কোনও ভাঁজ নেই। যেন চায়ের ভাঁড়ে শেষ চুমুক দিয়ে সেটা ঘেয়ো কুত্তার দিকে ফেলে দিল। অবহেলা, কিছুটা শাসন আর প্রচ্ছন্ন হুমকি।

টাকাটা আপনাকে এমন কিছু বেশি বলিনি। ডিপার্টমেন্ট ডিসি, কমিশনারকে দিয়ে ক'টাকাই বা আসবে? সরকারসাহেব পাঁচশো পঞ্চান্নর মাথাটা টেবিলে বার চারপাঁচ ঠুক লেন।

রাজা গত দশ বছরে অনেক অফিসার ঘেঁটেছে। সেও দু'বার ঢোঁক গেলে। হারামজাদা– হাড় হারামজাদা!

আয়কর ব্যবসায় আইনের অক্ষর থেকে বেআইনি চোরাগোপ্তা পথে বারবারই তাকে যেতে হয়। তবু যেন একটা গ্ল গুলনো ভয় শরীরের চড়াইউতরাই বেয়ে উঁকিঝুঁকি মারে, পাঁচ লাখ টাকা! তার প্রায় দু'বছরের রোজগার– আর লোকটা এক ঢোঁকে কোঁৎ করে গিলে নেবে। লোভ, কিছুটা অক্ষমতা আর বাকিটা আক্রোশ তাকে কাঁধের কাছে পাঁচ আঙুলের চাপ দেয়।

একটা বছরূপ ঞ্চাশের ঝুলকালো লোক। লাল, হলুদ যত চড়া রঙের জামা পরে। কেরানি থেকে সিঁড়ি বেয়ে এসি। অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার অফ ইনকাম ট্যাক্স (ইনভেস্টিগেশন)। তাকে থাপ্পড় মেরে বসিয়ে দেয়।

গুনুর মুণ্ডুটা ঘুরিয়ে দেব। বেশি ত্যান্ডাই ব্যান্ডাই করলে জানবেন আমার হাতেই ওর মরণ। টাকাটা দিয়ে দেবেন। সরকারসাহেবের মুখে নিভাঁজ তৃপ্তির হাসি।

গুনুভাই ওঝা। প্রৌঢ়, তীক্ষ্ণ নাক, গোলাকার দুই চোখ। রাজার মক্কেল।

কপালই বটে। যা ছোঁয় তাতেই সোনা। মাদ্রাজ, ফরিদাবাদ, গৌহাটি– তিনটি ব্রাঞ্চ অফিস। আলীপুরে বিরাট বাড়ি। ছাদে সাঁতারের খেলাখেলি। জলের তলায় নেমে আসা রাশরাশ ঘন নীল। গেটে প্রহরী। মসৃণ গালে দু'ধারে বাতিদান থেকে ঝরে পড়ে আলোর চকমকি। লিলিপুলের কাঠের সাঁকো পেরিয়ে যেতে গিয়ে পায়ের তলায় ছোট্ট নুড়ির বড় নিষ্প্রাণ আওয়াজ ওঠে। ক'টা বন্দী হৃদয়ের যেন ফিসফাস ডাক। পথ শেষে ডোবারম্যান। হিংস্র দুটো প্রাণীকে পেরিয়ে গুনুভাইয়ের গাড়িবারান্দা। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা। এরই এক পলকা ফোকড় বেয়ে বিপদ এসে ওঝা সাম্রাজ্য তছনছ করে দিল।

গুনুভাই গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ। চিনি, হোটেল, লরি, হরেকরকম ব্যবসা। ওরা তিন ভাই। গুনু, ভোগী আর রামু। ওঝারা রাজত্বের পরিধি শুধু বাড়িয়েই গেছে। ফলে ঘরের দিকটা অগোছালো।

বেহিসাবী টাকাপয়সা, গয়নাগাঁটি জমিজমা চারদি কে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। রাজা অনেকবার সাবধান করেছে। গুনু হেসে বলে, কি আর হবে রাজাবাবু? শুধু দেখবেন জেলফেল যেন না হয়, বাকিটা সামলে নেব।

রাজার মন তবু কিন্তু কিন্তু করে। ভাইয়ে ভাইয়ে মিল নেই। বিপদ হতে কতক্ষণ? সুখ আসে। সুখ থাকে। নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের ঘন তাপ ফিকে হয়ে যায়। জানলা খুলে চোরা হাওয়া উত্তাপ নিংড়ে নেয়। পেশাদারী নাকে বিপদের গন্ধ আসে। পরহিতে নিবেদিত প্রাণের অভাব নেই। শুধু একটা উড়ো চিঠি। তারপর ল্যাঠা সামলাও। রাজা মিত্তিরতো আছে! পয়সা দিয়েছ, আমার মাথাটা বাক্সবন্দী করেছ। তোমার সব পাপের বকলমা আমার। কিছু হলে সব দোষ আমার, তুমি শালা সত্যবানের ব্রাদার ইন ল। মাঝে মাঝে মক্কেলদের ঠাণ্ডা মনোভাব তার অসহ্য লাগে। যেন ভাজামাছটা উল্টে খেতে জানে না। সরলতা, অজ্ঞতা, সবরকম দৈবীভাবের পুলটিশ দিয়ে মুখটা বালগোপালের তিনসিকের কাছাকাছি এনে বলে– রাজাবাবু সবই কপাল! কপালে যা আছে তা হবে। ভেবে আর কি করব, আপনিতো আছেন!

কপালই বটে। যা ছোঁয় তাতেই সোনা। মাদ্রাজ, ফরিদাবাদ, গৌহাটি– তিনটি ব্রাঞ্চ অফিস। আলীপুরে বিরাট বাড়ি। ছাদে সাঁতারের খেলাখেলি। জলের তলায় নেমে আসা রাশরাশ ঘন নীল। গেটে প্রহরী। মসৃণ গালে দু'ধারে বাতিদান থেকে ঝরে পড়ে আলোর চকমকি। লিলিপুলের কাঠের সাঁকো পেরিয়ে যেতে গিয়ে পায়ের তলায় ছোট্ট নুড়ির বড় নিষ্প্রাণ আওয়াজ ওঠে। ক'টা বন্দী হৃদয়ের যেন ফিসফাস ডাক। পথ শেষে ডোবারম্যান। হিংস্র দুটো প্রাণীকে পেরিয়ে গুনুভাইয়ের গাড়িবারান্দা। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা। এরই এক পলকা ফোকড় বেয়ে বিপদ এসে ওঝা সাম্রাজ্য তছনছ করে দিল।

সকাল দশটা দশ। হেড অফিস, ব্রাঞ্চ অফিস, বাড়ি কারখানা বারাসতের অতিথিশালা, সব জায়গায় রেইড। ইনকাম ট্যাক্স রেইড। ডজন ডজন অফিসার ইন্সপেক্টর কেরানিবাবু মিলে ধুন্ধুমার কাণ্ড। গুনুভাই বাড়িতে ছিল। রাজাকে, ফোন করল– রাজাবাবু আমি গুনু।

রাজা প্রথমেই ধাক্কা খেল। ঠাণ্ডা স্বর। পরিচিত উচ্ছ্বাস নেই।

বিপদ রাজাবাবু, বিপদ!

ধাক্কা সামলাতে সামলাতে রাজা বলে, কী হল।

রেইড, ইনকাম ট্যাক্সের লোক। কী করব?

রাজা কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে নেয়। নগদ টাকা, শেয়ার স্ক্রিপ্টস্, গয়নাগাঁটি, হীরেজহরৎ, হাতখাতা, লোন কনফার্মেশন।

ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করে, কোত্থেকে ফোন করছেন?

বাড়ি থেকে। ঘর থেকে ফোন করতে দেয়নি, বাথরুমের লাইন থেকে বলছি।

ক'জন আছে?

প্রায় কুড়িবাইশজন। এইমা ত্র ফরিদাবাদ, গৌহাটি থেকেও ফোন করেছিল, ওখানেও গেছে। কী করব রাজাবাবু? বড্ড নার্ভাস লাগছে।

রাজা এই প্রথম গুনুভাইকে নতজানু হতে দেখে। যেন চোরাগর্তে পড়া একটা বুলডোজার। যন্ত্রণায় কাতরায়। অযান্ত্রিক এ শব্দে রাজা খুশি হয়। মনের কোণে কালো মেঘের আস্যাযাওয়া সে স্পষ্ট দেখতে পায়। গুনুর অফুরান টাকার যোগ্নবি য়োগের দু'পল ফাঁকে, সে দেখে ফেলে ভোগীর দু'টান মেরে ফেলে দেওয়া সিগারেট। গোঁড়ালির চাপে হাঁসফাঁস করে। তার চোয়াল শক্ত হয় বৈকি? সে লজ্জা পায়। চাপা স্বরে বলে, জলপানির ব্যবস্থা করেছেন?

কিছু খাচ্ছে না, সিগারেটও নয়, গুনুভাইয়ের উৎকণ্ঠিত সুর।

হাতখাতা কোথায়? শেয়ার স্ক্রিপ্টস্?

ঠাকুর ঘরে, রামলালার বেদীর তলায়।

গুড, ওঁরা সরকারি কর্মচারী, দে ওয়ান্ট ক্কোঅপা রেশন। সাহায্য করুন।

আমার যে সবকিছু গুলিয়ে যাচ্ছে। গুনুভাই আর্তনাদ করে ওঠে।

রাজা ধমক দেয়, গুলিয়ে গেলে চলবে কি করে? মনকে শক্ত করুন। খবর পেল কি করে?

আমার ভাগ্য রাজাবাবু, আমার ভাগ্য। ঘরে কালসাপ পোষা। বাবা একটা কেউটের বাচ্চা আমায় দিয়ে গেছেন।

রাজা গুনুর গোপন ব্যথার জায়গাটা আন্দাজ করে, ছোটভাই রামু। ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান। পৈত্রিক ব্যবসায় খুব একটা নাক গলায় না। শেয়ার কেনাবেচা আরও কি সব করে। নিজের আয়কর নিজেই সামলায়। বয়সে রাজারই কাছাকাছি, বছর পঁয়ত্রিশ। দক্ষিণদেশী মেয়েকে বিয়ে করে সকলের বিরাগভাজন। অবশ্য রামুর দিক থেকে খোঁচা মারার কারণ আছে। ব্যবসার বেশিরভাগ ননীটুকু গুনু আর ভোগী তুলে নেয়। ছিটেফোঁটা রামু যেটুকু পায় তা দুধমেশানো জল। পারিবারিক অশান্তির চূড়ান্ত। টুং টাং চুড়ির আওয়াজ থেকে খানখান গলার শব্দ আলীপুরের বিশুদ্ধ বাতাস বেয়ে রাস্তায় এসে পৌঁছে যায়। শেষে রামু বউকে নিয়ে ভবানীপুরে আস্তানা গাড়ে। রাজার মন রামুকে দোষী করতে চায় না। ভদ্র, মার্জিত, সৌম্য চেহারা, অন্য ভাইদের থেকে আলাদা। এ রকম একটা নীচ কাজ ওকে দিকে সম্ভব বলে মনে হয় না। তবু যেন সন্দেহের কাঁটা খচখচ করে। মনের ভাব চেপে রেখে বলে, ওঁদের কাজ করতে দিন আর সিজার লিস্ট দেখেশুনে সই করবেন। গুনুভাইকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ফোনটা রেখে দেন।

বিপদ আসে নিঃশব্দে। পায়ে পায়ে। বাজির পলতের মত গুমরে গুমরে আগুন এগিয়ে আসে। সাবধান হবার সময় দিয়েই সে আসে। কিন্তু বিস্ফোরণ হয়ই। পরে ধ্বংসস্তূপে বসে আফসোস হয়। ছোট্ট ভুল, অসাবধানতার বোকামি, আরও কত তুচ্ছতাতি চ্ছিল্যের খেসারৎ দিতে হয়।

অফিস, বাড়ি, ব্রাঞ্চ, অতিথিশালা মিলিয়ে পাওয়া গেল চল্লিশ লাখ টাকার গয়নাগাঁটি, শেয়ার, আরও সব দামী জিনিসপত্র। নগদ টাকা প্রায় দু'কোটি। একজন ইন্সপেক্টর হুলো বেড়ালের মত ঠাকুরঘরে হাজির হল। রামলালার বেদীর তলা থেকে বের করে আনল একটা হাতখাতা, পাতায় পাতায় নগদ জমাখর চের হিসাব।

দুই.

যুদ্ধ শেষের সকাল বিস্বাদে ভরা। আহত সৈনিকেরা যন্ত্রণার ঘোর কাটিয়ে এখনও স্বাভাবিক নয়। বিষণ্ণতার ছোঁয়া বুঝি ডোবারম্যানদুটোর চোখেও। বিশ্বস্ত ভৃত্যের মত ভোগীভাইয়ের দু'দিকে বসে। পোক্ত

ব্যবসায়ী ভোগীভাই অস্থিরতা চাপার ব্যর্থ চেষ্টায় পা নাচায় বাচ্চা ছেলের মত। সে তুলনায় গুনুভাই শান্ত। চোখের ভাষায় কোনও খবর নেই। রাজা বিরক্ত। ঘনঘন ঘড়ি দেখে। প্রায় এক ঘণ্টা সে এসেছে। শুধু ইঁদুর খোঁজা ছাড়া আলোচনার ফল শূন্য। এ রকম নিষ্ফল সভায় সে সাধারণত আসে না। কিন্তু আজকের ব্যাপার ভিন্ন। তার সবচেয়ে শাঁসালো মক্কেল ধরাশায়ী।

ভোগীভাই হঠাৎ পা নাচানি থামিয়ে চিৎকার করে ওঠে, আমি বলছি রাজাবাবু এটা রামুর কাণ্ড, ও শুয়োরের বাচ্চাকে আপনি চেনেন না। ওর হয়ে ওকালতি করবেন না।

রাজা হেসে ফেলে– আমার পেশাই ওকালতি, তাই কথাবার্তাই ও রকম। থাকগে, আপনারা কি রামুর শ্রাদ্ধই করবেন না কাজের কাজ কিছু করবেন।

গুনুভাই রাজার কথায় সায় দেয়। ধমক দিয়ে ভোগীকে থামিয়ে দেয়, তুই থাম। বাজে বকিস না। রাজাবাবুকে বলতে দে।

ভোগীভাই ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলে, তোমার তো গায়ে লাগবেই। পিরিতির নাং তো? আরও কিছু বলতে গিয়ে থেমে যায়, বিষম খায়।

গুনুভাইয়ের দুধসাদা গালে লালচে আভা– নিচু গলায় কিছু বলে। রাজা শুনতে পায়, বাস্টার্ড।

ভোগীর দু'পাশের কুকুরগুলো গোঙায়। যেন অজানা শত্রুর উদ্দেশ্যে যুদ্ধের মহড়া কষে। প্রভুর ইশারা পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে।

এ সব না দেখা না শোনার ভান করাই ভাল। ওঝা সাম্রাজ্যের সবাই ব্যাপারটা জানে। রাজাও আন্দাজ করে। দু'চারবার পারিবারিক পার্টিতে ওদের দেখেছে। গুনু আর রামুর বউ। ছাদের সুইমিং পুলে বা বলনাচের আসরে ওদের চোখের বিবশ ভাব ধরা না পড়ে উপায় নেই। সে কখনও মাথা ঘামায়নি। এটা ওর পেশাগত নীতির বাইরে। তবু আজকের এ ল্যাঙটা লড়াই তার মত দুঁদে উকিলকেও লজ্জা দেয়। বিরক্তিভরে বলে, গুনুভাই আমি উঠি। আপনারা ঝগড়া করুন।

ভোগী উঠে রাজার দু'হাত জড়িয়ে ধরে, স্যার অ্যায় বেগ আপলজি। কাল থেকে মাথাটা গরম হয়ে আছে। কিছু মনে করবেন না। তাছাড়া আপনিতো ঘরের লোক।

রাজা বসে পড়ে। গম্ভীর গলায় বলে, একটা মতলব ভেঁজেছি। জানি না কতদূর করতে পারব? কিছু অ্যাসেট আপনাদের কোম্পানির ব্যালেন্স শিটে দেখিয়ে দেব তাতে অন্তত পেনাল্টিটা বাঁচবে, ট্যাক্স যা দেবার দিতে হবে।

গুনু বলে, কোম্পানির রিটার্নটা বাকি আছে।

রাজা উদাসী সুরে বলে, জানি, উপায় একটা বার করতে হবে। আমার চিন্তা শুধু নগদ টাকা নিয়ে, কোথায় খাওয়াব?

টাকা ভগবান সবাইকে দেন না কিন্তু যাকে দেন ছপ্পর ভরে দেন। টাকার ফোয়ারা ওড়ে। গন্ধ চারদিকে ম ম করে। মাথার ওপর ঝাড়লণ্ঠনটার দামই লাখ টাকার ওপর। তলার কার্পেটে পা ডুবে যায়। মার্বেল দিয়ে ঘেরা বসার ঘরটাই একটা টেনিস কোর্টের সমান। চারদিক দুর্মূল্য অ্যান্টিকসে ভরা। রঁদার ধাঁচে গড়া মূর্তিটা পৌরুষ উঁচিয়ে আছে। অহংকার আর প্রাচুর্যের উত্তাপ ঘর জুড়ে। রাজার মনে কৌতূহল জাগে, সিজার লিস্টে এ সব ধরলে আরও কয়েক লাখ টাকা বেড়ে যেত। কে জানে কেন ওরা বাদ দিল? কতদিন ধরে জয়া একটা ভিসিআর কেনার কথা বলে আসছে। ঘরে কার্পেট নেই। ঝাড়লণ্ঠন তো দূরের কথা। বড় বড় নিশ্বাস ফেলা ছাড়া কিছু করার নেই। রামুর বিয়ের সময় জয়া ওর সঙ্গে এসেছিল। বাড়ি ফিরে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে, ওহ্ প্যারাডাইস, মাই ড্রিম! বাগানটা দেখেছ? যেন নন্দনকানন।

রাজা হেসে বলে, যেন হারিয়ে যেয়ো না। ওখানে অনেকেই হারিয়ে যায়। জয়া ভাবের বিস্ফোরণে লজ্জা পায়, কি যে বল? সত্যি বলছি এত সুন্দর বাড়ি আগে দেখিনি।

মনে হয় যেন ঘুমিয়ে পড়ি তাই না? রাজা কৌতুক করে।

জয়া স্বামীর কথায় কর্ণপাত না করে বলে, আমি বাথরুমে ঢুকেছিলাম। বাথটাব, গিজার, টেলিফোন– কি নেই? চারদিকে সাদা ধবধবে পাথর।

ওয়্যারড্রবটা খুলেছিলে?

কেন?

তাহলে দেখতে ওর মধ্যে একটা মিনিবার আছে।

জয়া না শোনার ভান করে, আচ্ছা ওরকম একটা বাথরুম করতে কত খরচ পড়বে?

রাজা ভ্রূ কুঁচকোয়– দশ্লবিশ লাখ টাকা তো বটেই। বেশি পড়লে আশ্চর্য হব না। তুমি কি ওরকম বাথরুমের কথা ভাবছ নাকি?

না, তা নয়। এমনি জিজ্ঞাসা করছিলাম।

জয়ার মনের নাগাল রাজা আর খোঁজ করার চেষ্টা করেনি। এড়িয়ে গিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে এসেছে। আজ লস্যির গেলাসে চুমুক দিয়ে সে কথা মনে পড়ে গেল। হঠাৎ বুঝতে পারে গুনু আর ভোগী দু'জনেই তার দিকে তাকিয়ে।

ভোগী জিজ্ঞাসা করে, রাজাবাবু কোনও পথ পেলেন নাকি?

গুনু বলে, হাতখাতার কি হবে? নগদ জম্মাখরচ সব লেখা আছে। ইনকামে ধরে নেবে নাকি?

ভরসা দিতে পারি না। কারণ আয়কর আইনে যে সব জমা বা সম্পত্তির হিসাব আপনি দিতে পারবেন না তা আয়ের মধ্যে ধরা হবে। অফিসারের সে ক্ষমতা আছে।

গুনু আর ভোগী চুপ মেরে যায়। ওঝা সাম্রাজ্যের টালমাটাল ভবিষ্যতের চিন্তায় দুই শিল্পপতির শিরদাঁড়া বেঁকে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। রাজা জানালার দিকে তাকায়। ঝাঁক ঝাঁক হলুদ ফুলে ভরা গাছটা দুঃস্বপ্নের ছোঁয়া এড়িয়ে ওঝাদের অস্তিত্বের ঠিকানা জানায়।

হতাশার ছোঁয়ায় যে ঘরের হাওয়া ভারী তা নিশ্বাসে টের পাওয়া যায়। নিজেকে অপরাধী মনে হয়। আসলে মক্কেলরা বুঝতে পারে না। সে কোনও সাচ্চা পেশাদার মক্কেলের ক্ষতি চায় না, হারজিতের সব ঝুঁকি কাঁধে তুলে নেয়। জেতার আনন্দ বা হারায় দুঃখ তার ব্যক্তিগত জগতে সীমাবদ্ধ থাকে। এটাই নিয়ম। কিন্তু মক্কেলরা এটা বুঝতে চায় না।

আয়কর বিভাগের সমন পেতে বেশ কিছুদিন লেগে গেল। এর মধ্যে রাজা হিসাব্লনিকাশ অ নেকটা গুছিয়ে নেয়। আত্মরক্ষার অস্ত্রশস্ত্র শান দিয়ে তৈরি রাখে।

অফিসার মিস্টার সরকার অতীব ভদ্রলোক। এক ধরনের লোক আছে যারা ধীরে ধীরে মানুষকে সম্মোহন করে। মিষ্টি হাসি, চায়ের পেয়ালা, কুশলবার্তা। আস্তে আস্তে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলে। কখন যে ক্যান্সারের মত তারা আক্রমণ করে বোঝা শক্ত। যখন বুঝতে পারা যায় তখন ক্ষত সারা দেহে।

প্রথম দিনই সরকারসাহেব সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দেন। রাজাকে একটা দিয়ে নিজে ধরান। অন্তরঙ্গ গলায় জিজ্ঞাসা করেন, মিত্তিরসাহেব, একটা উপকার করুন তো!

রাজা যেন আকাশের চাঁদ পায়। উদগ্রীব গলায় বলে, বলুন স্যার?

খুব চিন্তায় আছি বুঝেছেন? রাত্রে ঘুম হয় না।

রাজা আর্তনাদ করে, আপনি শুধু নামটা করুন স্যার যেখান থেকে পারি এনে দেব।

ছিঃ ছিঃ আমি কোন জিনিসের কথা বলছি না। একটা ছেলের কথা বলছিলাম।

রাজা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, ছেলে?

হাঁ মশাই হাঁ, মেয়েটা এমএ পড়ছে। বছরবাইশ বয়স, দেখতে শুনতে খারাপ নয়। একটা ভাল ছেলে জোগাড় করে দিন তো।

কয়েক সেকেন্ডের জন্য রাজা চুপ হয়ে যায়। এ রকম আবদার তার জীবনে প্রথম। সে বহু বায়নাক্কা মিটিয়েছে। অফিসারের গিন্নী কালীঘাট যাবে, গাড়ি চাই। মেয়েজামাই কাঠমা ন্ডুতে হানিমুন করবে, প্লেনের টিকিট চাই। ফুর্তি চাই। আরও কত চাই যে মিটিয়েছে তার ঠিকানা নেই। মক্কেলদের বললে তারা এক পায়ে রাজি। শালাদের দু'পয়সা ফি দিতে পেছন ভারি হয়ে যায় কিন্তু অফিসারকে দিতে রেড়ির তেলের অভাব হয় না। জীবনে মাঝে মাঝে ঘেন্না আসে। শালা, আমি দালাল, ইয়ের দালাল। শুধু মুখ ফুটে একবার বল হাজির করে দেব। আফসোস হয়, নিজের ছেলের বয়স সবে দশ। বছর পঁচিশ হলে সরকার সাহেবকে দেখিয়ে কাজ হাসিল করা যেত। কোথায় যে একটা রেডিমেড ছেলে

পাওয়া যাবে কে জানে। মেয়েটার বায়োডাটা নিয়ে দুচার টে ঘটক লাগাতে হবে। চিন্তিত সুরে বলে, স্যার, কেসটার একটা রাইট আপ এনেছি, দেখাব?

দূর মশাই, আপনার তো ভারি কাজের মাথা। মরছি নিজের জ্বালায়, গিন্নী বাড়িতে টিকতে দিচ্ছে না। একটা ছেলে জোগাড় করুন।

হাঁ স্যার, হাঁ স্যার। রাজা কপালের ঘাম মোছে।

আর শুনুন, দিনদশেক পরে একটা ডেট দিচ্ছি। সঙ্গে গুনুকে আনবেন। আলাপ্লপরিচয় করি।

আলাপ্লপরিচ য়ের সেই শুরু। মানসিক যন্ত্রণারও আরম্ভ। দিনের পর দিন বাইরের বেঞ্চিতে গুনুভাই আর ওকে বসিয়ে রাখত। এগারোটায় টাইম দিয়ে দুটোর সময় বেয়ারা ডাকত, সাব বুলায়া। একটা পাকা টনটনে ফোঁড়া সারা শরীর টাটিয়ে কষ্টের অনুভূতি অনেকটা যখন সইয়ে এনেছে তখন বেয়ারা এসে হুল ফুটিয়ে দেয়, সাব বুলায়া। ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে মানুষ অনেক কিছু করে ফেলে। খুন জখম নয়তো নতজানু হয়ে লুটিয়ে পড়ে। ঠিক সে সময় রাজার কিছু একটা করতে ইচ্ছা করত। কিন্তু কি আশ্চর্য। সাহেবের চেম্বারে ঢুকে সে সব ভুলে যায়। নিজের অজান্তে মুখের বেতাল রেখাগুলো মুছে ফেলে।

সরকারসাহেব সহাস্য অভ্যর্থনা করেন, আরে আসুন, আসুন।

এটা সাহেবের মনঃসমীক্ষার দ্বিতীয় পর্ব কিনা বুঝতে পারে না। তবে বোঝে তারা আস্তে আস্তে জালে জড়িয়ে পড়ছে। ফাঁকফোকড় বুজে আসছে। নড়াচড়ার জায়গা অল্প। এবার জালটা তোলার অপেক্ষা।

আপনাদের ফাইলটা পড়লাম, সাহেব গুনুভাইকে সিগারেট অফার করেন। গুনু রোবটের মত একটা তুলে নেয়।

রাজার উপস্থিতি ভুলে মিস্টার সরকার প্রশ্ন করেন, বাড়িতে দু'কোটি টাকা পাওয়া গেছে। ওটার সম্বন্ধে আপনার কি বক্তব্য মিস্টার ওঝা?

রাজা গুনুকে কিছু বলতে না দিয়ে তড়িঘড়ি করে বলে, ওটা স্যার কোম্পানির টাকা। ব্যালেন্স শিটে আড়াই কোটি টাকার মত নগদ আছে।

সরকারসাহেব ঠাণ্ডা গলায় বলেন, প্রশ্নটা আপনাকে করিনি মিস্টার মিত্র। গুনুভাইকে বলতে দিন।

রাজার রগের পাশটা জ্বালা করে। নিজের ওপর ঘেন্না আসে। শালা! বাংলাদেশে ছেলের অভাব কে এত জানত? দুচার টে ঘটক লাগিয়েও একটা জুৎসই ছেলে জোগাড় করতে পারল না। এখন ধাতানি খাও?

গুনুভাই হাত কচলায়। আমতা আমতা করে, স্যার অফিসে অত টাকা রাখা রিস্কি তাই বাড়িতে রেখেছিলাম। দুদিন বাদে লেবার পেমেন্ট ছিল, তা প্রায় দু'কোটি টাকার মত।

রাজা গুনুর দিকে সস্নেহে চায়। এই হচ্ছে বেওসায়ী। হাই আই কিউ। একদম ইনসট্যান্ট কফি। এত সুন্দর উত্তর গুনুভাই কি করে দিল ভেবে পায় না। আইনস্টাইনের আই কিউ নাকি সাধারণ ছিল। সত্যি গুনু নষ্ট প্রতিভা!

সরকারসাহেবের কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। সিগারেটের ডগায় জমে থাকা প্রায় ইঞ্চিখানেক ছাই সযত্নে ছাইদানে ফেলেন, অনেকক্ষণ ঠুকেঠুকে। তারপর একইতালে সুর বেঁধে প্রশ্ন করেন, টাকাটা এল কি করে? ব্যাংক থেকে তোলা? স্টেটমেন্টে দেখাতে পারেন?

গুনুভাই আমতা আমতা করেন, না স্যার, ওটা ওই জমে জমে হয়েছে।

মামার বাড়ি? জমে জমে হয়েছে? রোজ ডিম দেয় না? ক্যাশ টাকার ইনসিওরেন্স আছে?

গুনুভাই মিইয়ে যায়।

সরকারসাহেব আরেকটা তীর নিক্ষেপ করেন, আপনার হাতখাতায় অনেক টাকা জমা আছে। প্রায় বিশ লাখ। কোথায় পেলেন?

গুনুভাই অস্ফুট কিছু বলার চেষ্টা করে।

থাক থাক, বুঝেছি। কুড়িয়ে পেয়েছেন তাই তো?

রাজা থাকতে না পেরে উত্তেজিত স্বরে বলে, স্যার হাইকোর্ট রুলিং আছে...।

আমাকে হাইকোর্ট দেখাবেন না মিস্টার মিত্র। আমি খাঁটি চুঁচড়োর লোক। সরকারসাহেব একটা আস্ত সিগারেট ছাইদানে গুঁজে দেন।

রাজার মনে হয় এ মামলার শুনানি অনন্তকাল ধরে চলবে।

সময় তার লম্বা পা বাড়িয়ে পরিবর্তনের আঁচড় টেনে দেবে সব জায়গায়। রাজার দাঁত খসে পড়বে– চলাফেরার শক্তি নেই। সরকারসাহেব লম্বা লম্বা শুঁড় বার করবেন। অক্টোপাসের মত।

সে এগিয়ে চলে। চলতেই থাকে।

রাতে ক্যামপোজ লাগে। ঘুম নেই। জানলার বাইরে ক'টা একপেয়ে গাছ দোলে। যেন অশরীরী জীবের দল। উদ্বেগ, গরমের ছটফটানি। রাজা পাশ ফিরে জয়াকে জড়িয়ে ধরে।

জয়া বলে, ঘুম আসছে না?

না।

তুমি চোখ বুজে থাক, আমি হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। তারপর হাত বুলাতে বুলাতে বলে, কি ভাবছ? কেসের কথা, গুনুভাই?

হাঁ, ঠিক বলেছ।

জয়া ইষৎ রাগতকণ্ঠে বলে, একদম ভাববে না। ওরা কোটিপতি, ওদের কি হবে। তুমি মিছিমিছি রাতের ঘুম নষ্ট করছ।

তুমি বুঝবে না, দায়িত্ব।

দায়িত্ব? কিসের দায়িত্ব। ওরা এখন ঘুমচ্ছে এয়ার কন্ডিশন চালিয়ে, ডানলোপিলোয় মাথা দিয়ে। আর তুমি গরমে এপাশওপাশ করছ।

ভাগ্য! আমি আর কি করব?

জয়া ঝাঁজালো গলায় চিৎকার করে, ভাগ্য, তোমার বলতে এতটুকু লজ্জা হল না। পুরুষ মানুষ নিজের ভাগ্য নিজে গড়ে। তুমি যদি উদ্যোগী হতে ঘরে এসি চলত।

একবারে দুটো!

হাঁ দুটো!

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত'

হে জীবগণ ওঠ, নিজেকে জানো। মোহনিদ্রা থেকে জেগে মহাজনদের কাছে যাও। নিজের স্বরূপ জানো।

সামনে রুপোর খনি। আরো এগোও, সোনার খনি। আরো এগিয়ে যাও হীরের খনি পাবে। মহাপুরুষরা একথা বলেছেন। ফল পাবেই পাবে।

সরকারসাহেব আজ উদাসী। রাজাকে একা আসতে বলেছেন। পাক্কা এগারোটায় সে চেম্বারে ঢুকেছে। দুটো গিঁট ছাড়া আর সব সাফা। হাতখাতা আর দু'কোটি। মোটামুটি হিসেব কষে নিয়েছে– ট্যাক্স, প্রায় লাখুস স্তরের ধাক্কা। অঙ্কটা চিন্তা করলেই গা শিউরে ওঠে। অবশ্য আপিল করা যায় কিন্তু সেখানেও কি বিচার মিলবে? ছেলেবেলায় মাঝে মাঝে মনে হত অরণ্যদেব হয়ে যাই। লম্বা তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধে নেমে পড়ি। অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার সবকিছুর সঙ্গে মুখোশ এঁটে লড়াই করি। কৈশোরের সেই চাপা সদিচ্ছা নদীর ঘোলা জলে ঘুরপাক খেতে খেতে কবে রূপ হারিয়ে ফেলেছে। পলি সারা গায়ে। আজ আমার খুনের সাহস নেই। তবে নতজানু হবার উদারতা আছে। সেটার সঠিক উপস্থাপনাও আছে। তা আমার আয়ত্বে। খুঁতহীন ভদ্রতায় মোড়া আমি একজন আধাসফল পেশাদার।

সরকারসাহেবের চাহিদার অঙ্কটা শোনার পর থেকে রক্তচাপ চড়চড় করে বেড়ে গেছে। গুনুভাইকে কি করে রাজি করাবে ভেবে পায় না।

সরকারসাহেব জিজ্ঞাসা করেন, কি ভাবছেন মিস্টার মিত্র, মক্কেলের কথা?

লোকটা বোধহয় থট রিডিং করতে পারে। সত্যি নিজেকে লিলিপুট মনে হয়। লোভ এসে বিবেকের হাতকড়ি পরায়। বিবেকহীন মানুষ সংযমের বেড়া ডিঙিয়ে সাহসী হয়। পাপের পলেস্তরা মারা প্রতিষ্ঠার বেদী। মুখে আত্মবিশ্বাসের হাসি, জীবন যেন এরকম। গুনুকে বলুন, বুঝিয়ে বলুন। ঠিক রাজি হবে। হি ইজ এ জেম।

রাজা লক্ষ্য ঠিক করে নেয়। আস্তে আস্তে বলে, ঠিক আছে স্যার, বোঝানোর দায়িত্ব আমার। তবে আমার জন্য এক লাখ ধরে রাখবেন। সে সাহেবের চোখের দিকে সরাসরি চায়।

সাহেবের মুখে তখন সস্নেহ হাসি।

সুব্রত মণ্ডল ভারতের কবি, ছোটগল্পকার

প্রশিক্ষণ

ভারতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

ভারত সরকার ২০১৪১৫ অর্থ বছরে ভারতীয় কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা (ইন্ডিয়া টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনমিক কো অপারেশন্নআইটিইসি) কর্ম সূচির আওতায় প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রস্তাব দিচ্ছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ৪৮টি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে এসব কোর্সের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বিষয় যেমন– একাউন্টিং, টেলিযোগাযোগ, ইংরেজি, ব্যবস্থাপনা, গ্রামোন্নয়ন ও অন্যান্য বিশেষায়িত কারিগরি কোর্স। ভারত সরকার ৩৬ মা সের সংক্ষিপ্ত ও মাঝারি মেয়াদি এসব কোর্সের ব্যয়ভার বহন করে।

যোগ্যতা

আবেদনকারীর বয়স ২৫৪৫ বছ রের মধ্যে হবে এবং সরকারি বেসরকারি বিশেষায়িত কোর্সের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, স্বনামধন্য কর্পোরেট হাউস বা বাণিজ্যিক সংস্থায় কর্মরত ব্যক্তিবর্গ এ কোর্সে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। ইংরেজির ব্যবহারিক জ্ঞান অত্যাবশ্যক।

কিভাবে আবেদন করবেন

আবেদনকারীরা কর্মরত সংস্থার সুপারিশপত্রসহ আবেদনপত্র ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকায় পাঠাবেন। সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিকে অর্থমন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিশসহ আবেদনপত্র পাঠাতে হবে। কোর্সের বিস্তারিত বিবরণ এবং আবেদনপত্র নিম্নলিখিত লিঙ্ক থেকে পাওয়া যাবে:

http://itec.mea.gov.in/?pdf2980?000
http://itec.mea.gov.in/?pdf1325?000

লিঙ্কগুলো ভারতীয় হাই কমিশনের ওয়েবসাইট www.hcidhaka.gov.in-এর Education & Training সেকশনেও পাওয়া যাচ্ছে।

যে কোন তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন:
fscom@hcidhaka.gov.in

Training Programme in India

The Government of India offers the training courses under the India Technical and Economic Cooperation (ITEC) programme for the year 2014-15. The courses include diverse subjects such as Accounting, Telecommunication, English, Management, Rural Development and other specialized technical courses in over 48 reputed Institutions across India. They are typically short and medium term courses of between 3-6 months duration and are completely sponsored by the Government of India.

Eligibility

The applicants must be between 25-45 years of age and should have 5 years' relevant work experience in the area of specialized course in either Government or in a private organisation. They may belong to Government, Universities, reputed corporate houses or trade bodies. Working knowledge of English is essential.

How to apply

The applicants should forward their applications to the High Commission of India, Dhaka along with a letter of recommendation from the parent organisation of the applicant. Applicants working in the Government must approach the Economic Relations Division (ERD), Ministry of Finance or the Ministry of Foreign Affairs of the Government of Bangladesh for recommending the applications. The details of courses on offer for the year and application forms can be downloaded at the following links :-

http://itec.mea.gov.in/?pdf2980?000

http://itec.mea.gov.in/?pdf1325?000

The links are also available at the website of the High Commission of India at www.hcidhaka.gov.in under the Education & Training section.
Any queries may be addressed to
fscom@hcidhaka.gov.in

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

রূপকথা ভূতকথা ভালবাসা

সালেহা চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিত-র পর)

মৌটুসি

মৌটুসি বই খাতা রেখে বড়শি আর ডুঙ্গি নিয়ে বাড়ির পেছনে যায়। খড়ির ঘরে বড়শি থাকে আর ছিপ। শিনটি সরিয়ে যে জিনিসটা ও লুকিয়ে রেখেছিল সেটাকে আবার দেখে নেয়। ঠিকই আছে। ও আবার জিনিসটাকে ঢেকে দেয় সাদা শিনটির পর্বতের নিচে।
ছল ছল ডোবা ওকে দেখে কল কল করে। একটা ছোট বালতিতে একটু পানি দিয়ে রেখে দেয়। মাছ ধরা পড়লে ওখানে রাখবে। মৌটুসি স্কুলের জামা খুলে রাখে। টেপ জামার সাদা লেস বাতাস খায়। বড় জারুল গাছের তলায় ঘাসের কার্পেটে ও জুত হয়ে বসে। বড়শি ফেলেছে পানিতে। ফাতনা ভেসে আছে। ফাতনা ডুবে যায় দুইবার। ছোট দুটো মাছ পায় ও। বালতির পানিতে ছেড়ে দেয় ও। কী সব পাখি কিচ কিচ করতে করতে উড়ে গেল। মৌটুসির কেমন ঘুম ঘুম লাগে। এই নিথর নির্জনতায়, জারুলের বাতাসে দুই চোখ অসময়ে ধরে আসতে চায়। ছোট মাছ দুটো বালতির পানিতে ঘুরছে। ও কেঁচোর টোপ লাগিয়ে আবার বড়শি ফেলে বসে আছে।

গাছের মিষ্টি বাতাস ওর কাঁধের বব চুল নিয়ে খেলছে। সাঁ সাঁ হাওয়ায় তিনটে প্রজাপতি উড়ে গেল। নানা সব কলমি ফুলের সঙ্গে আরো নানা ফুল। মৌটুসি সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে স্কুলের জামাটাকে বালিশ বানিয়ে জারম্নল তলায় ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়ে। ফাতনার দিকে তাকিয়ে ও ভাবছে যখন অনেক মাছ হবে মা কেমন করে টক ঝাল দিয়ে এইসব মাছের পাতলা ঝোল করবেন আর বড় মাছ পেলে কালিয়া।

টুসি এস না আমাদের দেশে একটা ছোট মাছ ওকে বলছে। মাছটার গায়ের রং নীল। মৌটুসি বলে– তোমাদের দেশে আমি কী করে যাই। আমি তো মাছ না।

শোনো টুসি পানিতে পা রাখলেই তুমি চলে আসবে আমাদের দেশে।

মৌটুসি চেষ্টা করে। তারপর দিঘির দেশে। মাছেদের দেশে। নীলের মা ওকে বসতে বলে। আর কচুপাতার মত টেবিলে ঝিনুকের খোলায় চা আনে। মৌটুসি দেখে নীলের কুড়িজন ভাইবোন। ওদের নাম– কুচি, মিচি, সাচি, সারি, পুটি, টোনা, বোমা, রোমা, এমনি নামে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। মা বলেন– খবরদার কেঁচো দেখলে ফট করে গিলবি না। গলায় বড়শি আটকে মারা যাবি। মানুষ মাছ খেতে ভালবাসে। ডাঙায় তুললে এমনিতেই মারা যাবি। মানুষের মত আমাদের ফুসফুস নয়।

কেঁচো কী মা? একজন প্রশ্ন করে মাকে।

যখন গিলবি তখন জানবি কেঁচো কী। কলমি শাকের পাতার উপর ছোট ছোট সাবুদানার মত কী সব। মাছুমা ব লেন– খাও খাও এ আমাদের রসগোল্লা। মাছুমা ও কে শত্রু মনে করছেন না। বেশ সমাদর করছেন। ওদের একজন কাঁদছে। চোখ লাল। মায়ের পাখা দু'একদিন ওর পিঠ লাল করেছে, তবে বেশিদিন নয়।

কাঁদছ কেন মামি? নীল ওর মামিকে প্রশ্ন করে।

মামি বলেন, তার মেজো মেয়ে শ্যাওলা খানিক আগে টোপ গিলে ডাঙায় চলে গেছে। ওকে আর ফিরে পাবে না কেউ। নীল মৌটুসির দিকে তাকায়। কলমিপাতার উপর মিষ্টি রসগোল্লা ঢেউয়ে দুলছে। পানির ঢেউয়ে পাতার প্লেট ভাসছে। আসলে রসগোল্লা যে ব্যাঙের ডিম তা ও জানে না। ভাগ্যিস খায়নি। মৌটুসি ভাবে আমিই তো খানিক আগে শ্যাওলাকে ধরে বালতিতে রেখেছি।

কলমিটাকেও পাওয়া যাচ্ছে না। বলে নীলের চাচি। এইসব দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হয় মারমেডের মত কেউ তার সঙ্গে কথা বলছে তখন ও শুনতে পায় পরীর গলা। বলে– টুসি ওঠ ওঠ। দেখ তোর ছিপে একটা শরপুটি ধরা পড়েছে।

চোখ ঘষতে ঘষতে মৌটুসি উঠে বসে। ও ঘুমিয়ে পড়েছিল ঠাণ্ডা বাতাসে। পরীর খোলা চুল। পিঠের উপর দুলছে। পরীকে লাগছে বড় মৎসকন্যার মত।

শরপুটি বড় বড় শ্বাস টানছে। শ্যাওলা আর কলমির সঙ্গে। এরা মাছেদের দেশ থেকে ওর বড়শিতে ধরা পড়েছে। নীলের চেনা, ওদের মামাতো চাচাতো বোন। মৌটুসি বলে– দাঁড়া দেখি। বালতিতে আর একটু পানি তুলি যেন মাছগুলো ঠিকমত ঘুরতে পারে। বলেই ও কায়দা করে মাছগুলোকে পানিতে ছেড়ে দেয়। খানিক আগে মাছেদের দেশে ঝিনুকের খোলে চা খেয়েছে, পাতার প্লেটে সাগুদানার মত রসগোল্লা। নদীজলের চা। এখন এইসব মাছ ধরতে হবে? না। এখন নয়।

তুই একটা বোকার হদ্দ। মাছগুলোকে ছেড়ে দিলি। পরী চিৎকার করে বলে।

ছেড়ে দিলাম? ওরা হাত ফসকে পালাল। আবার ধরব। আজ আর না।

পরী হাতের মুঠোয় রঙ বেরঙের কাগজে মোড়া চকলেট। বলে– জানিস টুসি বাবা না আর কয়দিন পর নতুন মাকে আনবে?

ও। একটা চকলেট গালে পুরতে পুরতে মৌটুসি বলে। বলে উদাস হয়ে– তাহলে তোদের স্বাধীনতার বারোটা বাজল। মা নেই ওদের কোন মানা নেই কেবল সন্ধ্যায় ঠিকমত বাড়ি ফেরা ছাড়া। ওদের স্বাধীনতার সঙ্গে মৌটুসির স্বাধীনতার কোন তুলনা হয়? এ বাড়ির সবাই ওর বস। মা বস, বাবা বস আর মিঠুপা মস্ত ডিকটেটর। বাবা মাঝে মাঝে বলেন– তোর ডিকটেটরশিপ কেমন চলছে। মিঠুপা কোন উত্তর করেন না। ভাবখানা এই, আমি না দেখলে ও কি সব পরীক্ষায় পাশ করতে পারত। তখন মিঠুপা দস্যু মোহনের বই পড়ে। পরীক্ষা হয়ে গেলেই দস্যু মোহন। এখানে পরানের সঙ্গে মিঠুপার মিল আছে।

স্বাধীনতার বারোটা? ঠিক বলেছিস। এই বলে পরী মাছেদের মত জোরে নিশ্বাস নেয়।

মৌটুসি বলে– তবে মা থাকার সুবিধাও আছে। ও পরীকে খুব বেশি মন খারাপের মধ্যে রাখতে চায় না।

বাবা না এত খুশি জোরে জোরে গান করছিলেন। আমার পরান যাহা চায় এইসব। বললেন– নতুন মা খুব ভাল। বাবা চুল কালো করে, নতুন ফুল ফুল শার্ট পরে ঘুরছেন। বাবা যে এত জোরে গান করতে পারেন ভাবাই যায় না।

আমার বাবাও মাঝে মাঝে গান করেন। তবে নতুন মায়ের জন্য নয়, এই মায়ের জন্য। না হলে আমাদের জন্য। ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু।

আসুক না মা। আমাদের দুপুরের সাঁতার এবং আর সব কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। তোর মা আছে তারপরেও তোর জীবন বয়ে চলেছে নদীর মত। নদী বা খাল যাই হোক এখন মা নেই ভাবাই যায় না। বলেই মৌটুসি জামাটা পরে ফেলে। মা ডাকছেন।

পরী আর মৌটুসি বাড়ির ভেতরে আসে। শেষ পর্যন্ত মিঠুপার একটা নিজের শাড়ি হল। গোলাপি শাড়ি। সবুজ পাড়। খুবই সুন্দর শাড়িটা। মা বলেন– মাছ পেলি?

পেয়েছিলাম। হারিয়ে গেছে।

বাড়ির মাছে ঝোল হবে। তোরগুলো পেলে ভাজি হত।

দড়িতে অনেক কাপড় শুকোতে শুরু করেছে। সকাল সকাল কাজের মেয়ে সব কাপড় ধুয়ে ফেলেছে। উঠোনে সাবানের গন্ধ। মৌটুসি আর পরী কাপড়ের তলা দিয়ে ঘরে যায়। মিঠুপা বাড়িতে নেই। ও মিঠুপার চেয়ারে তারই ভঙ্গিতে বসে। পরী বসে আরেকটায়। এখন বাঁশঝাড়ে ভূতের ভয় নেই। এখন দিনের আলো। জানালার পাল্লা হাট করে খোলা। বলে ও– জানিস পরী বাবা না একটা বড় বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন শহরের মাঝখানে। সেখানে একতলায় বাবার অফিস, আর উপর তলায় আমাদের বাসা।

তার মানে তোরা চলে যাবি?

হ্যাঁ। অন্যবাড়িতে। দোতলা বাড়ি। বাড়ির চারপাশে গাছ। আতা, সফেদা, লিচু, বাতাবি এইসব।

কিন্তু সেখানে কি সাঁতার দেবার পুকুর আছে?

না। মৌটুসি মুখটাকে একটু করুণ করে।

তুই আমাকে ভুলে যাবি টুসি।

আমরা কি অন্য শহরে যাব ন্মকি? এই শহ রেই থাকব।

বড়লোকদের পাড়ায়।

বড়লোকদের পাড়া? তা তো জানি না। তবে আমি তোদের দেখতে আসব।

আসা হবে না তোর। ওখানে কতসব বন্ধু হবে।

তা হোক পরীরা থাকবে না। পুকুর থাকবে না। কিন্তু একটা ব্যাপার আছে যা ভাবতে ভাল লাগছে। ঠিক মিঠুপার ভঙ্গিতে ও কথা বলছে।

কি ব্যাপার?

আমার একটা নিজের ঘর হবে। সেখানে একটা ছোট টেবিল, একটা চেয়ার, আমার নিজের বিছানা এইসব থাকবে। মিঠুপার সঙ্গে আর থাকতে হবে না।

রাতে ভয় পেলে কি করবি?

মৌটুসি যে এমন ঘটনা ভাবেনি তা নয়। কিন্তু মনে মনে ঠিক করেছে ভয় পেলে মায়ের কাছে চলে যাবে।

একসময় পরী চলে যায়।

দুপুরে মা ঘুমিয়ে গেলে মৌটুসি সেই গাছপালার কাছে যায় যেখান থেকে হীরা ডালপালা, কাঠ, পাতা এইসব এনে মায়ের কাছে বিক্রি করে। মায়ের উঠোনের চুলোর জন্য। মৌটুসি পাতা কুড়ানো মেয়েদের মত ডালপালা জড় করে বাড়িতে নিয়ে আসে। একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে। মা অবাক হয়ে মৌটুসির দিকে তাকিয়ে আছেন। মা আছরের নামাজের জন্য ওজু করছেন। মৌটুসির দিকে তাকিয়ে থাকেন। কাঁধ পর্যন্ত চুলের মাথার উপর ডালাপাতা– ঠিক হীরার মত।

এগুলো কেন?

তুমি চুলো জ্বালাবে তাই।

মা বিস্মিত। না পাখার ডাঁট দিয়ে পিটিয়ে পিঠ লাল করেন না। কাছে ডাকেন। যে পানিতে ওজু করছিলেন তাই দিয়ে ওর মুখ মুছিয়ে দেন। ওর ঘামে ভেজা মুখ মায়ের শীতল পানিতে স্নিগ্ধ হয়ে যায়। মা অনেকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকেন। চুল সরান কপালের উপর থেকে।

এসব আর কোনদিন করিস না।

কেন?

তুই হীরা নস।

আমি কেন হীরার কাজ করতে পারব না।

কারণ? এমনিই নিয়ম। হীরা কি তোর মত স্কুলে যায়?

ওর মা ওকে স্কুলে পাঠাতে পারেন না। ওরা গরীব তাই।

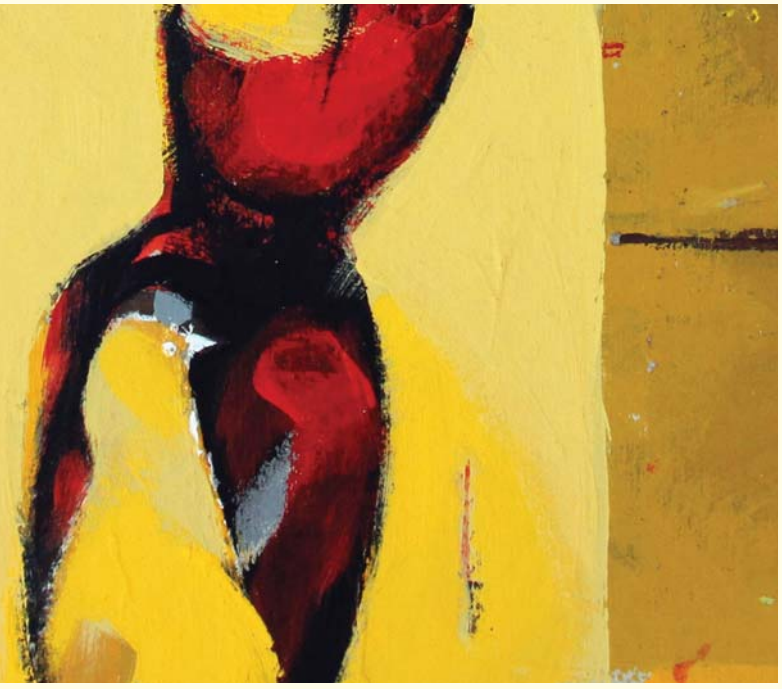

আমাকে এসব বলতে হবে না। কোনদিন হীরার কাজ করতে যাস না। আর যেন কোনদিন এসব ব্যাপার না ঘটে। ওর বাবা ঠেলাগাড়ি চালায়। আর তোর বাবা স্কুল ইনস্পেকটর। এসব তোকে বুঝতে হবে।

আমি বুঝতে চাই না।

মা এবার রেগে যান। কঠিন চোখে তাকান। বলেন– না বুঝলে ভবিষ্যতে তোর কপালে দুঃখ আছে। মৌটুসি কপাল চুলকায়। মা ওজু শেষ করবেন। তিনি পানি আনতে আবার কলতলায় যান। কিছু শুকনো ডালপালা উঠোনে পড়ে থাকে। মায়ের বিনা পয়সার জ্বালানি। তবু মা মোটেই খুশি নন।

ওরে আমার পাতাকুড়ানি বোন। মিঠুপা বাঁকা চোখে ওকে দেখছেন। মৌটুসি রাগ করে বাবার কাছে যায়। তিনি এসব জানেন না। বলেন– কাজলা আয়। বাবার কাছেই ও কেবল কাজল বা কাজলা। আর সকলের কাছে মৌটুসি। স্কুলের খাতায় আবিদা সুলতানা। তিনি বলেন– কী হয়েছে রে?

কিছু না বাবা। মৌটুসি বাবার চেয়ারের পেছনে হাতল ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। ওর সমুদ্র হৃদয় বাবাও এমন কাজে সায় দেবেন না ও বুঝতে পারে।

চার.

প্রত্যেকদিন বিকালে তুই কোথায় যাসরে পরান?

পরান পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে সাইকেলের কাদা পরিষ্কার করছিল ও চোখ তুলে মৌটুসিকে দেখে। তারপর আবার কাদামোছার কাজে লেগে যায়। বলে, আমার উপর গোয়েন্দাগিরি করছিস নাকি রে টুসি? কুয়াশা সিরিজ রবি ভাইয়া এনে দিয়েছেন আর?

তোর না কেবল ঠাট্টা। আমি দেখি রোজদিন পাঁচটার দিকে বাস্কেটে বইপত্র ভরে তুই কোথায় যেন যাস। শাপলাদীঘিটিঘি পার হয়ে। তারপর আসিস সন্ধ্যায়। কখনো সন্ধ্যার পর।

পরান কিছু বলে না। চোখগেলো পাখিটাকে ভেংচায় মৌটুসি। –চোখ গেল? তাহলে আমরা তোমার চোখের চশমার ব্যবস্থা করছি। ভেবো না। মৌটুসি আবার বলে– পরাণ তুই যে আমাকে সাইকেল চড়াতে শেখাবি বলছিলি কই শেখালি নাতো। তাই রোজদিন একবার তোর খোঁজ করি।

শেখাব শেখাব। হাতে একটু সময় পেলে। এই ধর রোজার বন্ধে।

মৌটুসি পানিতে ঢেউ তুলে বলে– কেন পরী তোকে কিছু বলেনি?

কী বলবে পরি? পরানের সাইকেল ধোওয়া হয়ে গেছে।

এখানে আমরা আর থাকব না।

তার মানে? চাচা কি বদলি হয়ে অন্য জায়গায় যাবেন?

অন্য জায়গায় নয়, এখানেই, অন্যবাড়িতে।

অন্য বাড়িতে? কোথায়?

শহরের মধ্যে। আব্বা বাসা আর অফিস একসঙ্গে করবেন। একটা দোতলা বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন। বাড়িটার নাম শুনবি?

কি নাম?

চৈতালি।

ওরে বাবা মাস্টার পাড়া থেকে একেবারে শহরের মধ্যে চৈতালিতে? দারুণ প্রমোশন।

আমার একটা নিজের ঘর থাকবে। পানিতে ঠেউ তুলে আবার বলে মৌটুসি।

নিজের ঘর? তাহলে তো প্রমোশনের ষোলকলা পূর্ণ।

পরী কি খালার বাড়িতে?

পরান সাইকেল ঠেলে ওপরে তোলে। পেছনে মৌটুসি। –খালার বাড়িতে। বলে– আজো তো শেখাতে পারতিরে পরান।

তা পারতাম। কিন্তু যেখানে তুই আমাকে যেতে দেখেছিস সেইখানে আজ যেতে হবে যে। গোয়েন্দাগিরি করে সমস্নটময়ও জানা হ য়েছে তোর।

চারপাশের সবুজ ঘাসে মুখ ভার মৌটুসিকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পরান। একটা নতুন জামায়, শিমুলের মত লাল ফুল মাথায়! একেবারে বেড়াতে যাবার মত মিষ্টি। –উঠে পড়। পেছনের সিটে।

পরান বলছে।

আমি উঠে পড়ব পেছনের সিটে? বিস্মিত মৌটুসি। ড্যাবডেবে কাজলচোখে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে।

হ্যাঁ আপনি। আমি কি ওই গাছটাকে বলছি নাকি?

সত্যিই পরান আজ মুডে আছে। এমন এক রাইডের জন্য পরী বা মৌটুসি নামাজের শেষে স্পেশাল দোয়া পড়তে পারে একমাস ধরে। যে দোয়া পড়লে অনেক কিছু পাওয়া যায়। কেন বলছে? মৌটুসি চলে যাবে বলে ওর কি খারাপ লাগছে? হয়তো। হয়তো বলাই ভাল। পরান এসব বলে না। বড় ছেলে বা মানুষ হয়ে উঠবার কাজে সদাব্যস্ত। এবং এমন এক বড় মানুষ– কী সাধ্য আছে মৌটুসির সবসময় ওকে বুঝতে পারে।

মৌটুসি জামাটাকে একটু উপরে তুলে সাইকেলের পেছনের সিটে বসে। তারপর পরানের পিঠে হাত রাখে। –ভাল করে ধর। পড়ে যাস না।

একসময় পেছনে বসাটা সহজ হয়। বড় রাস্তা ছাড়িয়ে, চষা মাঠের পাশ দিয়ে তুফান মেলের মত সাইকেল চলেছে। শাপলাদীঘি পার হয় পরান। বাতাস লাগছে গায়ে। ফিতের ফুল উড়ছে বাতাসে। এক পাশটা একটু লম্বা হয়ে খুলে গেছে।

গান করতে ইচ্ছা করছে?

কেমন করে বুঝলিরে পরান?

আমি মন পড়তে পারি জানিস না?

সেবারে রবি ভাইয়া ওকে শিখিয়েছিল 'শান্ত নদীটি পটে আঁকা ছবিটি।'

গুণ গুণ করে মৌটুসি। শোনা যায় পরানও দু'এক লাইন মেলাতে চেষ্টা করছে। মৌটুসি গান থামিয়ে বলে– কোথায় চলেছি রে আমরা?

আর দুই মিনিট ম্যাডাম। আপনার গোয়েন্দাগিরি আজই শেষ হবে।

অগণিত ইউক্যালিপ্‌টাস ছাওয়া একটি বাড়ি। ধবধবে চিনির মত সাদা। এদিকে মৌটুসি আগে আসেনি। সে সাইকেল থেকে নামতে নামতে বলল, বাড়িটা কার?

সেটা জানতে আর এক মিনিট বাকি।

বাড়িটার নাম আছে। গেটের উপর সাদা মার্বেল পাথরে লেখা 'কল্যাণী।'

বারান্দা থেকে খবর গেল ভেতরে। বারান্দায় রাখা অনেকগুলো সুন্দর চেয়ারের একটিতে মৌটুসি বসে। অন্যটিতে পরান। বেশ অনেকটা পথ আসতে হয়েছে ওকে। এখন একটু ক্লান্ত। সে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল– কেমন সাইকেল চালাই বলত টুসি?

খুবই ভাল। ওদের কথা শেষ হয় না সেগুন কাঠের দরজা ঠেলে চাকাচেয়ারে বসে থাকা একটি ছেলে মিষ্টি হাসিতে এগিয়ে আসে। ছেলেটি পরানের বয়সী কিম্বা একটু ছোট। পরান বলে– কেমন আছিস আজ শুভাশিস?

উত্তর না দিয়ে কেবল মাথা নাড়ে ও। –ধর বইগুলো নে। সারামুখে আলো ফেলে ছেলেটা বই নিতে হাত বাড়ায়। তারপর পায়ের ওপর রাখা চাদরের ওপর বইগুলো রাখে। মৌটুসি তাকিয়ে আছে। সে ভাবছে ছেলেটা কি আর হাঁটবে না? ওর কি কোন দুর্ঘটনা হয়েছে? পরান কেমন করে ছেলেটাকে চেনে?

পরান বলে– ও মৌটুসি। ওকে আমরা ডাকি টুসি বলে। শুভাশিস তখনো হাসছে। কী সুন্দর সে হাসি। কে বলবে সে চাকাচেয়ারে আটকে থাকা একজন। এ বাড়িতে শুভাশীসের মা আর বাবাও আছেন। টমি বলে একটা আদুরে কুকুর আছে। যে সারাক্ষণই বসে থাকে শুভাশিসের পায়ের কাছে। বলে শুভাশিস– টুসি তুমি কিছু খাবে?

না। তুমি বুঝি বই খুব ভালবাসো?

বই আর গান। আর পরানের মত বন্ধু। ও আমাকে সময় পেলেই লাইব্রেরি থেকে বই এনে দেয়।

ওরা তিনজন বই নিয়ে গল্প করছে– একটি লালপাড়ের শাড়ি পরা অত্যন্ত সুন্দর একজন হাতে ট্রে নিয়ে ওদের সামনে দাঁড়ায়। তিনজনার মাঝখানে একটা বেতের টেবিল বসিয়ে দেয় কাজের ছেলে। কিন্তু খাবারের ট্রে তিনি নিজে এনেছেন। ঘরে বানানো নাড়ু, তক্তি এইসব। তার সঙ্গে ডালমুট। আর ঠাণ্ডা শরবত। আমার মা। শুভাশিস বলে। মা

বলেছেন নতুন কাউকে দেখলে সালাম দিতে হয়। ও তাড়াতাড়ি বলে– সালামু আলাইকুম। তিনি হেসে মৌটুসিকে বুকের কাছে টেনে নেন। ফিতের ফুলটা ঠিক করেন। চিবুক ধরে আদর করেন। শঙ্খের মত সাদা হাতে শঙ্খের শাঁখা। তার সঙ্গে আরো চুড়ি টুড়ি। কপালের লাল টিপে কী যে ভাল লাগছে মৌটুসি বোঝাতে পারবে না। লম্বা সরু চেন বুকের ওপর। কানে লাল পাথরের দুল। তিনি বলেন– মৌটুসি? আমার খুবই প্রিয় নাম। তোমরা বসো, খাও। গল্প কর কেমন?

উনি চলে যেতেই তিনজন আবার গল্প করে। মৌটুসি খুব বেশি কথা বলে না। কথা বলছে ওরা দুজন। পরান আর শুভাশিস। যে পরান সব কাজ ফেলে রোজদিন একবার আসে। বাবার বকুনি ভুলে যে কখনো কখনো সন্ধ্যার পর বাড়ি যায়। বই আনে, কথা আনে, আনন্দ আনে। ওরা বই দেখছে, বইয়ের ছবি দেখছে। একসময় পরানকে বলতে হয়– শুভ এবার তাহলে যেতে হয়।

আর একটু বোসো পরান।

কাতর গলায় শুভ বলে। যেন পরান চলে গেলে বড় একা হয়ে যাবে ও। বলে শুভাশিস– তুমিও আবার এস টুসি।

আচ্ছা– ঘাড় নেড়ে জানায় ও।

ওদের মা আবার আসেন। তিনিও বলেন– মৌটুসি মামণি তুমি আবার এস। মৌটুসি বলে– এই বাড়ির নাম কি আপনার নামে? তিনি একটু অবাক হয়ে বলেন– কী করে বুঝলে? ও কেবল হাসে। তিনি বলেন– তুমি খুব বুদ্ধিমতী মৌটুসি। বাড়িটা আমারই নামে। তিনি আবার ওর ফিতের ফুল ঠিক করেন। জামার উপর লেগে থাকা খাবারের গুঁড়ো মুছে দেন। মুখটাকেও মোছান। বলেন– আবার এস তুমি।

একটু একটু আঁধার তখন। বাবার বকুনির তোয়াক্কা না করে এখানেই ও যতটা পারে সময় কাটায়। আশ্চর্য মৌটুসি এত বড় চাঁদ আগে দেখেছে তবে মাঠের মাঝখানের ফিতের মত পথের উপর নয়। সব শান্ত। কেউ এখন গান গাইবার মুডে নেই।

ওকে দেখতে রোজদিন আসিস?

ওকে দেখতে।

ওর মা খুব ভাল।

তুই এরপর মাকে দেখে আদাব বলবি। সালাম বলবি না।

কেন?

ওরা হিন্দু, তাই।

সেদিনই মৌটুসি একটি হিন্দু পরিবারকে এত কাছে থেকে দেখল। স্কুলে দুই একজন হিন্দু মেয়ে পড়ে ওর সঙ্গে। আরতি আর সুষমা। সে কখনো হিন্দু কাদের বলে সে নিয়ে ভাবেনি।

আমাদের সঙ্গে কোনই পার্থক্য নেই তাহলে সালাম বলা যাবে না কেন?

দেখ টুসি তর্ক করবি না। যা বলছি মনে রাখলে ভাল।

আমাকে আবার নিয়ে আসবি?

যে ভাবে মিষ্টি খেয়ে খেয়ে ব্যারোল হচ্ছিস তোকে এভাবে আনা কঠিন হবে।

মৌটুসি পরানের পিঠে দুম করে একটা কিল দিয়ে বলে– আনব না বললেই হয়। মোটা ব্যারোল এসব বলার দরকার কী?

পরান কথা বলে না। কেবল আঁধার কেটে পানসির মত সাইকেল চালাচ্ছে। ফিনকিফোটা জোছনায়, শর্ষে মাঠে হলুদফুল। পরান শিস দেয়। মৌটুসি শিস শোনে। ও শিস দিতে পারে না। অনেকবার চেষ্টা করেছিল। পরান বলে– খুব চেষ্টা করলে একদিন শিখে ফেলবি।

মৌটুসি বলে– মনে হয় শিখতে পারব না।

চৈতালিতে যাবি। তখন যদি শেখা হয় আমাকে বলতে আসিস। মৌটুসি বলে কেবল– তুই আর পরী সাঁ সাঁ সাইকেল চালিয়ে আমাকে দেখতে আসিস যেমন শুভাশিসকে দেখতে যাস।

তুই কি ওর মত চাকাচেয়ারে বন্দী? ও কবে ভাল হবে কেউ জানে না।

ও কেবল যারা চাকাচেয়ারে বন্দী তাদের দেখতে যাবি?

তা ঠিক নয়। শুভাশিসের বন্ধু বলতে আমি। বাড়িতে মাস্টার এসে পড়ায়। স্কুলে গেলে দু'একজন আসত ওর খোঁজ নিতে। কেউ আসে না। একদিন সাইকেল নিয়ে এখানে এসেছিলাম।

আলাপ হল কেমন করে?

এত কথা তোকে বলতে হবে নাকি? আর তাছাড়া তোর আরো বন্ধু হবে। কিন্তু আপাতত ওর সেই সম্ভাবনা নেই।

আর কোনদিন মৌটুসি এমনি সাইকেলে চেপে এখানে আসবে? হয়তো আর কোনদিন নয়।

পাঁচ.

মেলার খবর আব্বার সেই বন্ধু দিলেন যিনি ওর 'খুকু ও কাঠবেরালি' কবিতা শুনে এক ঠোঙ্গা নধর চকলেট কিনে দিয়েছিলেন। মৌটুসিকে দেখে বললেন– আজ যদি একটা কবিতা শোনাতে পারো তোমাকে এক মজার জায়গায় নিয়ে যাব। তিনি আর আব্বা বসার ঘরে কথা বা গল্প করছিলেন। মৌটুসি বলে– কোথায় নিয়ে যাবেন?

বললাম তো মজার জায়গা।

মৌটুসি মনে মনে কবিতা ভাবতে চেষ্টা করে। অন্যকে মুগ্ধ করবার মত কোন কবিতা ওর মনে পড়ে না। তারপর মুখটা আলো হয়ে যায় একটা কবিতা মনে পড়াতে– 'খাই খাই করো কেন এসো বসো আহারে/ খাওয়াব আজব খাওয়া ভোজ কয় যাহারে।' ও ভেবেছিল ওর পুরো কবিতা মনে নেই। আবৃত্তি করতে গিয়ে বুঝতে পারে সবটাই ওর মনে আছে। এবার ও তাকায় আব্বার পাগলামত বন্ধুর দিকে। তিনি কি ওর এই কবিতায় মজার জায়গায় নিয়ে যাবেন? তিনি মুগ্ধ। ওর যাওয়া হবে।

যাও ভেতর বাড়ি থেকে তৈরি হয়ে এস।

বাড়ির ভেতরে গিয়ে এমন কথা বলতেই মিঠুপা বলেন– বেশ সুখেই আছিস। আজ এখানে কাল সেখানে।

মা বলেন– দে না একটু ঠিকঠাক করে। কোথায় আর এত জায়গায় যায়?

আচ্ছা দিচ্ছি। ও তোমার ছোটমেয়ে।

চুলের গোড়া টেনে একটা পনিটেল বেঁধে দিলেন মিঠুপা। যেন কপাল টন টন করছে এত জোরে। নতুন টেপজামা বের করলেন। প্রথমে কুরুশকাটায় টেপ, তারপর জামা। ও নিজেই বানাতে পারে। দর্জির কাছে যেতে হয় না। দুটো জিনিস শিখেছে ক্রুশকাঁটায়। একটি টেপ আর অন্যটি বাড়ির জিনিসপত্র ঢাকার জন্য গোল গোল ঢাকনি। আয়নার ঢাকনি হয়েছে, প্রতিটি গস্নাশের ঢাকনি হয়েছে, মায়ের পানদানির ঢাকনি আর মাঝখানের ছোট টেবিলের জন্য ঢাকনি। ও বলে– যাচ্ছিস কোথায় শুনি?

আব্বার পাগলামত বন্ধুতো কিছু বললেন না।

হুঁ। মিঠুপা বলেন।

মা ঘরে এসে ওর হাতে এক টাকা দিয়ে বলেন– মেলায় যাচ্ছে ও। তোমার আব্বা বললেন।

মেলায়? এরপর মিঠুপা একটা আটটানা দিয়ে বললেন– চারআনা খরচ করবি আর চারআনার নকুলদানা এইসব আনবি। মনে থাকবে?

থাকবে? বলে মৌটুসি। তারপর বলে– চার আনার নকুল দানাতো অনেক হবে।

তা হোক। চাচাকে দিস ব্যাগটা।

আজ ও বিশাল বড়লোক। মায়ের এক টাকা তার সঙ্গে মিঠুপার আটআনা। ছোটখামে পয়সা ভরে ও ওর প্যান্টের পকেটে রাখে। কালু দর্জির কাছে গিয়ে এইসব কারণে ও প্যান্টের পকেট বানিয়ে নিয়েছে। সেখানে বেশ একটু জিপও লাগিয়ে দিয়েছে কালু দর্জি। প্রথমে অবশ্য বলেছিল– ইংকা কেংকা কতা? ছোলকোনা কয় কী? বেটিছোলোর প্যান্টোত পকেট।

রেগে বলেছিল মৌটুসি– ছোলকোনা ছোলকোনা বলবেন না দর্জিচাচা। যা বলছি করবেন।

হয় হয় করমো। তার আগে তোমার আব্বাক কয়া নাগবি। বেটিছোলোর প্যান্টোত পকেট?

আমি পরব আমার প্যান্ট। আমার আব্বা পরবে নাকি?

যিংকা তোমার খুশি। এই বলে ঘর ঘর করে পা দিয়ে সেলাইমেশিন চালায় দর্জি। ও কালু দর্জির কাছ থেকে ছোটখাটো টুকরো কাপড় সংগ্রহ করে। সেগুলো দিয়ে পুতুলের জামাটামা করে। ও আর পরী যখন সময় পায় এইসব বানায়, তারপর খেলা করে।

তবে গজ গজ করলেও বেশ ভাল করে দুটো পকেট বানিয়ে দিয়েছে কালুচাচা। টাকা পড়ে যাবার ভয় নেই। ও এবার একটা ছোট পার্সে টাকা ভরে পকেটে রাখে।

• পরবর্তী সংখ্যায়

সালেহা চৌধুরী প্রবাসী কথাসাহিত্যিক

রাজা বিক্রমাদিত্য ও বত্রিশ পুতুলের গল্প

পুনর্কথন **ড. দুলাল ভৌমিক**

ভূমিকা

সংস্কৃত সাহিত্যে গল্প অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি শাখা। নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিষয়ে গল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এ সাহিত্যের সৃষ্টি। শিশু কি শোব্বযুব্ব ৃদ্ধ সব বয়সের মানুষই এ থেকে শিক্ষালাভ করতে পারে। মানুষের পাশাপাশি মনুষ্যেতর প্রাণী, এমনকি জড়বস্তুও এতে চরিত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সহজসরল ভাষায় এমন আশ্চর্য ভঙ্গিতে গল্পগুলো রচিত যে, অতি সহজেই সেগুলো পাঠকচিত্ত আকর্ষণ করে।

সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীন ও সার্থক গ্রন্থ হচ্ছে পঞ্চতন্ত্র। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক কিংবা তার কিছু পরে বিষ্ণুশর্মা এটি রচনা করেন। এর অনুকরণে পরবর্তীকালে নারায়ণ শর্মা রচনা করেন হিতোপদেশ। এছাড়া আরো কয়েকটি বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ হল গুণাঢ্যের বৃহৎকথা, বুদ্ধস্বামীর বৃহৎকথা শ্লোকসংগ্রহ, ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরী, শিবদাসের বেতালপঞ্চবিংশতি, দণ্ডীর দশকুমারচরিত, সোমদেব ভট্টর কথাসরিৎসাগর ইত্যাদি। এগুলো ছাড়া আরো একটি উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ হচ্ছে দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা। এটি মহাকবি কালিদাসের রচনা বলে কথিত হয়। সে হিসেবে এর রচনাকাল খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক। এই দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিক্যাই রাজা বি ক্রমাদিত্য ও বত্রিশ পুতুলের গল্প নামে বাংলা ভাষায় নতুনভাবে উপস্থাপিত হল।

দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকার গল্পগুলো রাজা বিক্রমাদিত্যকে নিয়ে রচিত। তাঁর বিভিন্ন গুণের কথা এতে বর্ণিত হয়েছে।

বিক্রমাদিত্যরা ছিলেন দুই ভাই। অগ্রজ ভর্তৃহরি– উজ্জয়িনীর রাজা। একদিন তিনি অনুজ বিক্রমাদিত্যকে রাজ্যভার অর্পণ করে বানপ্রস্থ গ্রহণ করেন। বিক্রমাদিত্য রাজ্যের সকলকে পরম সমাদরে পালন করে সকলের প্রিয়ভাজন হন।

একদিন প্রত্যূষে এক দিগম্বর সন্ন্যাসী আসেন তাঁর কাছে। তিনি মহাশ্মশানে এক মহাহোম করবেন। তাই যাতে কোন বিঘ্ন না ঘটে তার ব্যবস্থা গ্রহণে রাজাকে অনুরোধ করেন। বিক্রমাদিত্য সর্বপ্রকারে সন্ন্যাসীকে সাহায্য করেন এবং সন্ন্যাসী অত্যন্ত প্রীত হন। তাঁর আশীর্বাদে বিক্রমাদিত্য বেতালসিদ্ধ হন। বেতাল হল প্রেতাত্মা এবং সর্বকাজে পারদর্শী।

এদিকে ঋষি বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যায় রত। তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করতে হবে। এ্কা জে কে সমর্থ– রম্ভা না উর্বশী? দেবরাজ ইন্দ্র মহাচিন্তায় পড়লেন। দেবর্ষি নারদ বললেন: এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধাম্ত্ম দিতে পারেন একমাত্র রাজা বিক্রমাদিত্য।

দেবরাজের নির্দেশে তাঁর সারথি মাতলি পুষ্পকরথ নিয়ে মর্তে বিক্রমাদিত্যের নিকট হাজির হলেন। মাতলির মুখে সব শুনে বিক্রমাদিত্য রথে চড়ে স্বর্গে গেলেন– দেবরাজের সভায়। সেখানে শুরম্ন হল রম্ভাউর্বশীর নৃত্য গীতের প্রতিযোগিতা। কেউ কম নন। তবে বিক্রমাদিত্যের সূক্ষ্ম বিচারে উর্বশী অধিকতর যোগ্য বলে বিবেচিত হলেন।

দেবরাজ ভীষণ খুশি হলেন বিক্রমাদিত্যের বিচারের ক্ষমতা দেখে। তাই পুরস্কারস্বরূপ তিনি বিক্রমাদিত্যকে মণিমাণিক্যখচিত একটি ব হুমূল্য রত্নসিংহাসন উপহার দিলেন। বিক্রমাদিত্য সিংহাসন নিয়ে রাজ্যে ফিরে এলেন এবং কোন এক শুভদিনে শুভক্ষণে সিংহাসনে উপবেশন করলেন। আর সুখে প্রজাপালন করতে লাগলেন।

হঠাৎ একদিন রাজ্যে ভীষণ বিপদ দেখা দিল। ধূমকেতুর উদয়, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, প্রলয়ঝড়– কোনটাই বাদ নেই। রাজা এর কারণ জানতে চাইলেন। তিনি দৈবজ্ঞদের ডাকলেন। তাঁরা বললেন: সন্ধ্যাকালে ভূমিকম্প হলে কিংবা অগ্ন্যুৎপাত পীতবর্ণযুক্ত হলে রাজার প্রাণনাশের আশঙ্কা দেখা দেয়।

একথা শুনে রাজার তখন অতীতের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। তিনি একবার মহাশক্তির সাধনা করেছিলেন। সাধনায় তুষ্ট হয়ে দেবী তাঁকে বর দিতে চাইলেন। রাজা অমরত্বের বর চাইলেন। দেবী বললেন: জগতে কেউ অমর নয়। তবে একমাত্র আড়াই বছরের কন্যার গর্ভজাত পুত্রের হাতেই তোমার মৃত্যু হবে।

বিক্রমাদিত্যের একথা শুনে দৈবজ্ঞরা বললেন: কোথাও আড়াই বছরের কন্যার পুত্র জন্মেছে কিনা তা অনুস ন্ধান করা প্রয়োজন।

বিক্রমাদিত্যের নির্দেশে বেতাল অনুসন্ধানে বের হল। কিছুদিনের মধ্যেই সে সঠিক খবর নিয়ে ফিরে এল। প্রতিষ্ঠা নগরে শেষনাগের ঔরসে আড়াই বছরের কন্যার গর্ভে এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছে। নাম তাঁর শালিবাহন। তিনি এখন কৈশোরে পদার্পণ করেছেন।

বেতালের কথা শুনে রাজার কপালে চিন্তার রেখা দেখা দিল। তিনি আর বিলম্ব না করে তরবারি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। শালিবাহনের সঙ্গে তাঁর ভীষণ যুদ্ধ হল। কিন্তু ভবিতব্য অনুযায়ী এই শালিবাহনের হাতেই বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হল।

বিক্রমাদিত্য ছিলেন অপুত্রক। তাই তাঁর সভাপণ্ডিত বললেন: অনুসন্ধান করা হোক রাজার কোন রানি অন্তঃসত্ত্বা কিনা।

অনুসন্ধানে জানা গেল– রানিদের মধ্যে একজনের গর্ভসঞ্চার হয়েছে। তখন সেই গর্ভস্থ সন্তানের নামে পারিষদবর্গ রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলেন। দেবরাজ প্রদত্ত সিংহাসনটি শূন্যই পড়ে রইল।

কিছুদিন পরে পারিষদবর্গ এক দৈববাণী শুনতে পেলেন: যেহেতু এই সিংহাসনে বসার উপযুক্ত কেউ নেই, সেহেতু একে একটি পবিত্র স্থানে রাখা হোক।

দৈববাণী অনুযায়ী পারিষদবর্গ সিংহাসনটিকে একটি পবিত্র স্থানে রেখে দিলেন। কালক্রমে একদিন সিংহাসনটি মাটির নিচে চাপা পড়ে গেল। সবাই ভুলেই গেল যে, এখানে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ঐতিহ্যবাহী রত্নসিংহাসনটি ছিল। সেই জায়গাটি এখন কৃষিক্ষেত্র এবং এক ব্রাহ্মণ চাষির দখলে। তিনি ঐ জায়গায় একটি মাচা তৈরি করে তার উপর বসে খেত পাহারা দেন।

একদিন ঘটল এক অলৌকিক ঘটনা। ব্রাহ্মণ মাচার উপরে বসে আছেন। এমন সময় মহারাজ ভোজ সসৈন্যে ওর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ব্রাহ্মণ বিনয়ের সঙ্গে বললেন: মহারাজ! আপনি আমার অতিথি। আপনার অশ্বগুলো ক্ষুধার্ত, পরিশ্রান্ত। ওগুলোকে আমার খেতে ছেড়ে দিন। ওরা যথেচ্ছ আহার গ্রহণ করুক।

ব্রাহ্মণের কথা শুনে রাজা থামলেন এবং সৈন্যদের বললেন অশ্বগুলোকে ছেড়ে দিতে। সৈন্যরা তাই করল এবং অশ্বগুলো যথেচ্ছ খেতের ফসল খেতে লাগল।

এমন সময় ব্রাহ্মণ মাচা থেকে নেমে এসে আর্তস্বরে চিৎকার করে বলতে লাগলেন: একি করছেন, মহারাজ! রাজা হয়ে প্রজা পীড়ন করছেন! দেখুনতো আপনার অশ্বগুলো আমার খেতের কিরূপ ক্ষতিসাধন করছে!

ব্রাহ্মণের কথায় রাজা তো হতবাক। তিনি সৈন্যদের বললেন খেত থেকে অশ্বগুলো তুলে আনতে। সৈন্যরা তাই করল এবং রাজা চলে যেতে উদ্যত হলেন। এমন সময় ব্রাহ্মণ মাচায় গিয়ে বসে আবার মিনতিভরা কণ্ঠে বলতে লাগলেন: একি মহারাজ! আপনি চলে যাচ্ছেন যে? আপনি না আমার অতিথি? অতিথি বিরূপ হয়ে চলে গেলে আমার অমঙ্গল হবে। আপনি ইচ্ছেমত অশ্বগুলোকে খেতের ফসল খাওয়ান।

রাজা ভোজ এবার বিস্মিত হলেন ব্রাহ্মণের এই অদ্ভুত আচরণ দেখে। ব্রাহ্মণ মাচার উপরে থাকলে একরকম আচরণ করেন, মাচা থেকে নামলে আবার অন্যরূপ ধারণ করেন। তিনি এর রহস্য ভেদ করার জন্য স্বয়ং মাচার উপরে গিয়ে বসলেন। তখন তিনি অনুভব করলেন– তাঁর মধ্যেও এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। তিনিও যেন তাঁর সমস্ত সম্পদ প্রজাদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে পারেন। তিনি বুঝতে পারলেন– এই মাচার নিচে অলৌকিক কিছু একটা আছে। তিনি তখন মাচা থেকে নেমে এসে যথেষ্ট দাম দিয়ে ব্রাহ্মণের কাছ থেকে ঐ জায়গাটি কিনে নিলেন। যথাসময়ে মাটি খুঁড়ে দেখতে পেলেন একটি সিংহাসন। এটিই দেবরাজ প্রদত্ত মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সেই রত্নসিংহাসন। ভোজরাজ যারপরনাই খুশি হলেন। কিন্তু শত চেষ্টা করেও সিংহাসনটি তিনি তুলতে পারলেন না। তারপর মন্ত্রীর পরামর্শে তিনি যথাবিহিত যাগ্যয জ্ঞাদির অনুষ্ঠান করলেন এবং তখন সিংহাসনটি আপনি উঠে এল। রাজা ভোজ অতি যত্নের সঙ্গে সিংহাসনটি রাজধানীতে নিয়ে এলেন। সিংহাসনে বত্রিশটি পুতুলের মূর্তি খোদিত ছিল। রাজা যখন পুতুলগুলোর মাথায় পা রেখে সিংহাসনে বসতে যাচ্ছিলেন, তখন প্রত্যেকটি পুতুল রাজা বিক্রমাদিত্যের শৌর্য্যবীর্য, দয়া দাক্ষিণ্য ইত্যাদি সম্পর্কে একেকটি গল্প বলেছিল। এ থেকেই গ্রন্থের নাম হয়েছে দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা। এতে বত্রিশটি গল্প আছে। বর্তমান কালের পাঠকের উপযোগী করে গল্পগুলো রাজা বিক্রমাদিত্য ও বত্রিশ পুতুলের গল্প নামে নতুনভাবে উপস্থাপিত হল। এ গল্পগুলো পড়লে পাঠকের মধ্যে, বিশেষত শিশুদের মধ্যে মহানুভবতা, পরোপকারিতা, দানশীলতা, ধৈর্য, শৌর্য, বীর্য, ঔদার্য, সাহসিকতা ইত্যাদির মনোভাব সৃষ্টি হবে।

এ পর্যন্ত আমরা সাতটি পুতুলের গল্প শুনেছি। এবার শোনা যাক চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ পুতুলের গল্প:

চতুর্দশ পুতুলের গল্প

ভোজরাজ পুনরায় সিংহাসনে আরোহণ করতে গেলে চতুর্দশ পুত্তলিকা বলল: রাজন! আপনি যদি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় দৈবে বিশ্বাসী এবং বিষয়ের প্রতি নিরাসক্ত হন, তাহলেই এই দিব্য সিংহাসনে বসতে পারেন।

ভোজরাজ বললেন: কি সেই ঘটনা? খুলে বল।

পুত্তলিকা বলতে লাগল: মহারাজ বিক্রমাদিত্য একবার রাজকর্মচারীদের ওপর রাজ্যভার অর্পণ করে দেশ ভ্রমণে বের হন। পথে এক যোগীবর তাঁকে চিনতে পেরে বলেন: মহারাজ! কর্মচারীদের ওপর রাজ্যভার দিয়ে পর্যটনে বের হওয়া আপনার উচিত হয়নি। শাস্ত্র বলে: বিদ্যা কৃষি বাণিজ্য পত্নী ও ধন-সম্পদ সতর্কতার সঙ্গে নিজেকেই রক্ষা করতে হয়। বিড়ালের সামনে দুধের বাটি রাখলে সে দুধ কি আর থাকে?

উত্তরে মহারাজ বললেন: যোগীবর! মানুষ কোন কিছু সযত্নে রক্ষা করলেও তা কি সুরক্ষিত থাকে? আসলে দৈবই হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী। সে-ই রক্ষক, আবার সে-ই ভক্ষক। তাইতো রাজা চন্দ্রশেখরকে নিজের রাজ্য হারাতে হয়েছিল, আবার নতুন রাজ্যের রাজা হতে হয়েছিল।

যোগীবর বললেন: কি রকম?

বিক্রমাদিত্য বললেন: উত্তর দেশে চন্দ্রশেখর নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে রাজ্য পরিচালনা করছিলেন। কিন্তু তাঁর জ্ঞাতিগণ একসময় তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তাঁদের সঙ্গে রাজার যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে রাজা পরাজিত হন এবং রানিসহ রাজ্য ছেড়ে চলে যান। চলতে-চলতে তাঁরা এক ভিন্ রাজ্যে প্রবেশ করেন। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে তাঁরা এক গাছের নিচে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সেই গাছে বাস করত কয়েকটি পাখি। একটি পাখি অন্যদের বলছিল: জানো, এদেশের রাজার মৃত্যু হয়েছে।

রাজা ও রানি পাখিদের কথাবার্তা শুনলেন। তারপর তাঁরা আবার পথ চলতে লাগলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর সেই দেশের কয়েকজন রাজকর্মচারীর সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়। তাঁরা চন্দ্রশেখরের দেহে রাজলক্ষণ দেখে তাঁকে সেই দেশের নতুন রাজা মনোনীত করলেন।

নতুন রাজত্ব পেয়ে চন্দ্রশেখরের দিন ভালই কাটছিল। কিন্তু পার্শ্ববর্তী রাজারা একত্রিত হয়ে একদিন সেই রাজ্য আক্রমণ করলেন। রাজা চন্দ্রশেখর তখন রানির সঙ্গে পাশা খেলছিলেন। রানি রাজাকে তাঁর কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। কিন্তু রাজা বললেন: দেখ, জ্ঞাতিদের কাছে নিজের রাজ্য হারিয়ে দৈববলে নতুন রাজ্য পেয়েছি। তাই এ-রাজ্য দৈবই রক্ষা করবেন।

হলও তাই। আক্রমণকারী রাজারা পরাজিত হলেন এবং চন্দ্রশেখরের রাজ্য রক্ষা পেল। চন্দ্রশেখর বুঝলেন: সবই দৈবের কাজ।

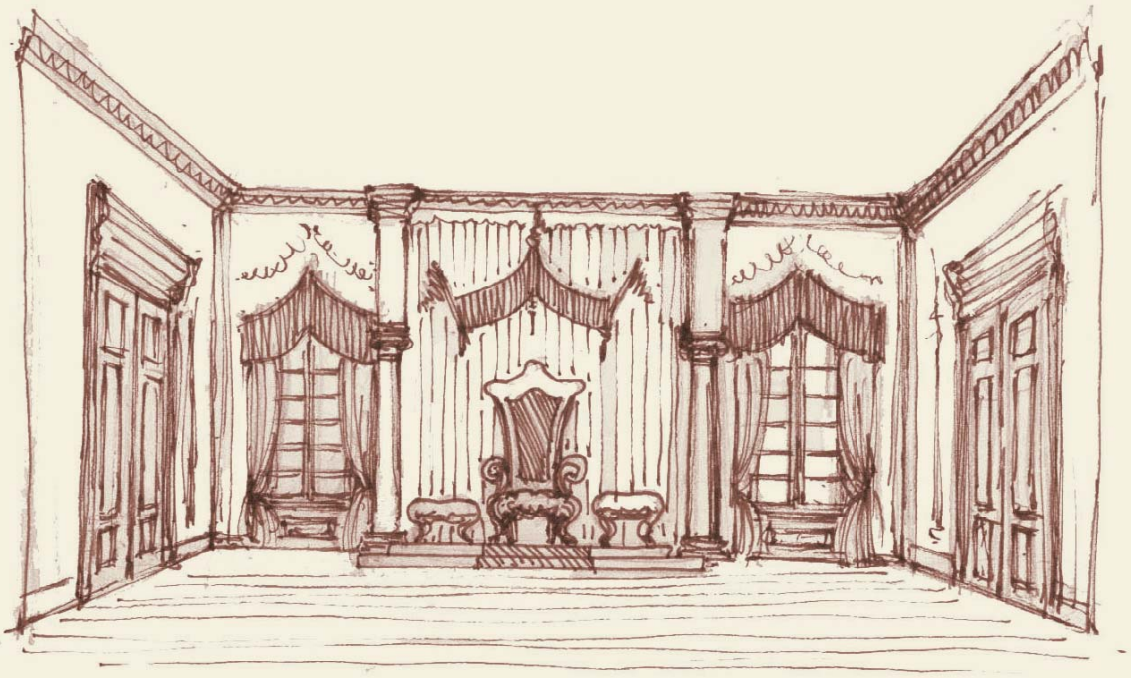

কিন্তু দীর্ঘকাল চন্দ্রশেখর রাজ্য ভোগ করলেন না। একদিন রাজ্যসুখ ত্যাগ করে রানিকে নিয়ে তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন।

এ-কথা বলে মহারাজ বিক্রমাদিত্য যোগীবরের উদ্দেশে বললেন: হে যোগীবর! রাজার কাজ রাজ্য পরিচালনা করা, প্রজাদের সেবা করা; রাজ্য ভোগ করা নয়। তাই রাজ্য চলে যাওয়ার ভয় আমার নেই। যে-ক'দিন রাজা থাকব, প্রজাদের সেবা করে যাব। আর কিছুই চাই না।

বিক্রমাদিত্যের কথায় যোগীবর অতিশয় প্রীত হলেন এবং তাঁকে আশীর্বাদ করে নিজের গন্তব্যে চলে গেলেন।

কাহিনি শেষ করে পুত্তলিকাটি ভোজরাজকে বলল: হে রাজন! আপনিও যদি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় এরূপ দৈববিশ্বাসী ও বিষয়ে নিরাসক্ত হন, তাহলে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

পুত্তলিকার কথা শুনে ভোজরাজ নির্বাক দাঁড়িয়ে রইলেন।

পঞ্চদশ পুতুলের গল্প

ভোজরাজ পুনরায় সিংহাসন-আরোহণে উদ্যোগী হলে পঞ্চদশ পুত্তলিকাটি বলল: হে রাজন! আপনি যদি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় ত্যাগব্রতী হন, তাহলে এই সিংহাসনে বসার উপযুক্ত হবেন।

ভোজরাজ বললেন: মহারাজ বিক্রমাদিত্য কিরকম ত্যাগব্রতী ছিলেন?

পুতুলটি বলতে লাগল: মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজপুরোহিত ছিলেন বসুমিত্র। সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তিনি একবার গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে বারাণসী গেলেন। সেখানে গঙ্গার পুণ্যসলিলে অবগাহন করে বিশ্বেশ্বর দর্শন করলেন। তারপর আবার রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করলেন।

ফেরার পথে এক নগরে বসুমিত্র বিশ্রাম করছিলেন। তখন জানতে পারলেন ঐ নগরের পরিচালিকা এক অভিশপ্ত দেবাঙ্গনা। তাঁর প্রাসাদের পাশে আছে একটি লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির এবং একটি বিবাহ-মণ্ডপ। মন্দিরের রক্ষক চিৎকার করে বলছে: কেউ যদি এই ফুটন্ত তেলের কড়ায় নামে, তাহলে সঞ্জীবনী নামে অপ্সরা তার গলায় বরমাল্য পরাবেন।

কিন্তু ফুটন্ত তেলের মধ্যে কেউ নামতে সাহস করছে না।

বসুমিত্র স্বরাজ্যে ফিরে এই আশ্চর্য ঘটনা মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে জানালেন। বিক্রমাদিত্য কালবিলম্ব না করে বসুমিত্রকে নিয়ে সেখানে পৌঁছলেন এবং তেলের কড়ায় ঝাঁপ দিলেন। মুহূর্তে তাঁর শরীর গলে একটা মাংসপিণ্ডে পরিণত হল। সঞ্জীবনী অপ্সরা তখন ঐ মাংসপিণ্ডে অমৃতবারি সিঞ্চন করতেই মহারাজ দিব্যদেহ ধারণ করলেন।

অপ্সরা এবার মহারাজকে বরমাল্য পরাতে এগিয়ে এলেন। মহারাজ তখন বিনয়ের সঙ্গে বললেন: হে দেবী! আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্নই হয়ে থাকেন, তাহলে আমার পরিবর্তে এই সর্বশাস্ত্রজ্ঞ বসুমিত্রকে বরমাল্য পরান। তাতেই আমি খুশি হব।

মহারাজের অনুরোধে সঞ্জীবনী বসুমিত্রের গলায় বরমাল্য পরিয়ে দিলেন। মহারাজের এই উদারতা ও ত্যাগের মহিমা দেখে উপস্থিত সকলে ধন্য-ধন্য করতে লাগল।

কাহিনি শেষ করে পুত্তলিকাটি বলল: হে ভোজরাজ! আপনি যদি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় এরূপ উদার ও ত্যাগব্রতী হন, তাহলে সিংহাসনে আরোহণ করুন।

পুত্তলিকার কথার কোন জবাব না দিয়ে ভোজরাজ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ষোড়শ পুতুলের গল্প

এবার ভোজরাজ ষোড়শ পুতুলের মাথায় পা দিয়ে সিংহাসনে বসতে গেলেন। অমনি পুতুলটি বলে উঠল: হে রাজন! আপনি যদি মহারাজ বিক্রমাদিতের ন্যায় দানশীল হন, তাহলে এই রত্নসিংহাসনে উপবেশন করুন।

ভোজরাজ বললেন: মহারাজ বিক্রমাদিত্য কিরকম দানশীল ছিলেন?

পুতুলটি বলল: একদিন মহারাজ সিংহাসনে বসে আছেন। এমন সময় এক ব্রাহ্মণ এলেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। ব্রাহ্মণ বললেন: মহারাজ! আমার আটটি পুত্র সন্তান। আমরা একটি কন্যা সন্তানের জন্য মা জগদম্বার কাছে আকুল প্রার্থনা জানিয়েছিলাম আর প্রতিজ্ঞা করেছিলাম– কন্যাসন্তান জন্মালে সম-ওজনের স্বর্ণ দান করব এবং এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সঙ্গে তার বিয়ে দেব। মা আমাদের প্রার্থনা শুনেছেন। তাঁর কৃপায় আমরা এক অপরূপ কন্যাসন্তান লাভ করেছি। তার বিয়ের সময়ও উপস্থিত। কিন্তু মহারাজ! আমাদের সেই সামর্থ্য কই– সম-ওজনের স্বর্ণদানের? আপনি ছাড়া আর কে আছে আমাদের এই সাধ পূর্ণ করার জন্য?

সব শুনে মহারাজ ভাণ্ডারীকে আদেশ দিলেন ব্রাহ্মণকে তাঁর কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ স্বর্ণ দিতে। ভাণ্ডারী তাই দিলেন। স্বর্ণ পেয়ে ব্রাহ্মণ মহারাজকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রসন্নচিত্তে বাড়ি ফিরে গেলেন এবং মেয়ের বিয়ে দিয়ে কন্যাদায় থেকে মুক্ত হলেন।

পুতুলটি এবার ভোজরাজের উদ্দেশে বলল: তাই বলছিলাম, হে রাজন! আপনি যদি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় দানশীল হন, তাহলে এই সিংহাসনে আরোহণ করুন।

ভোজরাজ নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রইলেন।

● পরবর্তী সংখ্যায়

ড. দুলাল ভৌমিক
শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

ছোটগল্প

কান্না

শাহনাজ নাসরীন

বারান্দার গ্রিলের সঙ্গে লেপটে আছে আনিকা। পিঠময় এলোমেলো চুল, মাখনরঙা শরীরে একাকার হয়ে লেপটে আছে অফ হোয়াইট লিলেনের তুলতুলে রাতপোশাক। এই দুপুরে ধাক্কা লাগার মতই ব্যাপার। অন্তত আনিকাকে চিনলে। ভোরে উঠে পোশাক পাল্টে ব্যায়াম করে স্নানের পর আরো একদফা পোশাক পাল্টে সাজপাট সেরে তারপর নাস্তা করে দিন শুরু হয় তার!

পেছন থেকে দেখে মনে হচ্ছে বাইরের ধুম বৃষ্টি দেখছে, আর হাত বাড়িয়ে ছুঁয়েও নিচ্ছে বেশ করে। তার যা স্বভাব, বৃষ্টি নিয়ে আদিখ্যেতা বিসদৃশ। আজ কী স্বভাবের বিপরীতে চলার দিন নাকি! তবে গত চার পাঁচদিনের তীব্র দাবদাহের পর এই বৃষ্টি সবাইকেই মাতাল করেছে বলা যায়। তারপরেও আনিকা আসলে বৃষ্টি উপভোগের জন্য নয়, দাঁড়িয়ে আছে কান্না সামলানোর জন্য। উদ্‌গত কান্নার কাঁপন বাঁচাতে শরীরটাকে গ্রিলে চেপে ধরেছে শক্ত করে আর হাত বাড়িয়ে তালুতে খানিকটা করে জল জমিয়ে নিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে অবাধ্য অশ্রুর ওপর। কাউকে সে তার কান্না দেখাবে না।

আনিকার দাদুদাদি একমত হন যে মুজার চেয়ে ভাল ছেলে আর হয় না। বয়স বেশি তো কী হয়েছে, আজকাল বয়স কোন ব্যাপার নাকি! তারা শুনেছেন কত মেয়ে নাকি নিজের পছন্দেই তাদের চেয়ে তিরিশ্লচল্লিশ বছরের বড় পুরুষকে সতীনসহই বিয়ে করে। মুজার তো সেই সমস্যা নাই। তাছাড়া তাকে সেই কত আগে থেকে তাঁরা চেনেন, জানেন। তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করেন যে এমন নিরীহ ছেলে হয় না। আনিকার মা অবশ্য অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। তাতে চাচ্লাচাচী খানিকটা বির ক্ত হলে দাদি জানান এটা কিছু না।

দেখায়ও না। আসলে সে কাঁদেই না অনেক কাল। সেই যে পনের বছর বয়সে ক্লাশ নাইনের ফাইনাল পরীক্ষার পর তার চেয়ে চব্বিশ বছরের বড় ড. মুজাম্মেল হকের সঙ্গে তার বিয়ে হল। যেদিন বিয়ে হয় সেদিনও তার ডাগর চোখের কোল বেয়ে এক বিন্দু জল গড়িয়ে পড়তে দেখা যায়নি।

ড. মুজাম্মেল আনিকার বড় চাচার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ছাত্রাবস্থায় প্রতি ছুটিতেই আনিকাদের বাড়িতে চলে আসত ম্লাহারা বাড়ি তে মন লাগত না বলে। আনিকার দাদি অপত্য স্নেহে তাকে কাছে টেনে নিতেন, নানারকম সুস্বাদু খাবার তৈরি করে তাকে আনন্দ দিতে চেষ্টা করতেন। পাশ করার পর তিনি স্কলারশিপ নিয়ে জাপানে চলে যান এবং দীর্ঘ সময় সেখানেই কাটিয়ে দেশে ফিরেছেন বছরখানেক আগে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছেন প্রফেসর হিসেবে, গৃহ পেয়েছেন; বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্টার, তাতে একজন গৃহিণী প্রয়োজন। তিনি খুঁজছিলেন, বন্ধু হিসেবে আনিকার চাচাও সেই দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

সেই সময়ে আনিকার বাবা মারা গেলে পিঠেপিঠি দু'বোন ও শিশু ভাইটিকে নিয়ে আনিকার মাসহ পুরো পরিবার গাড্ডায় পড়ে। গাড্ডা কারণ আনিকার বাবার কোন সম্পদ বা সঞ্চয় ছিল না, যা দিয়ে শহরে চলে আসা যায় বা মেয়েদের হোস্টেলে রেখে পড়ানো যায়। গাড্ডা কারণ গ্রামে দু'টি সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী মেয়েকে অভিভাবকহীন রাখা যায় না। অভিভাবকহীন কারণ যুবতী মা এবং বৃদ্ধ দাদা সমর্থ অভিভাবকরূপে গণ্য নন। এমতাবস্থায় আনিকার বাবার কুলখানিতেই ঢাকাবাসী একমাত্র চাচার ওপর এই সমস্যা সমাধানের ভার পড়ল। সেক্ষেত্রে চাচার ওপরই দুই ভাস্তির দায়িত্ব বর্তায় কিন্তু চাচী নিভৃতে নিজেদের কন্যার ভবিষ্যৎ ও স্বল্প সামর্থ্যের দোহাই দিয়ে ড. মুজাম্মেলকে সবলতার প্রতীকরূপে স্বামীর কাছে উপস্থাপন করেন। সুতরাং চাচা ঢাকায় ফিরে ড. মুজাম্মেলের কাছে ছুটে গেলেন এবং পরিবারটিকে উদ্ধারের দায়িত্ব তার সবল কাঁধে চাপালেন।

একমাসের মাথায় চাচা যখন বাড়িতে আবার আসেন এবং প্রস্তাবটি উপস্থাপন করেন এবং আনিকার দাদুদাদি একমত হন যে মুজার চেয়ে ভাল ছেলে আর হয় না। বয়স বেশি তো কী হয়েছে, আজকাল বয়স কোন ব্যাপার নাকি! তারা শুনেছেন কত মেয়ে নাকি নিজের পছন্দেই তাদের চেয়ে তিরিশ্লচল্লিশ বছরের বড় পুরুষকে সতীনসহই বিয়ে করে। মুজার তো সেই সমস্যা নাই। তাছাড়া তাকে সেই কত আগে থেকে তাঁরা চেনেন, জানেন। তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করেন যে এমন নিরীহ ছেলে হয় না। আনিকার মা অবশ্য অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। তাতে চাচ্লাচাচী খানিকটা বির ক্ত হলে দাদি জানান এটা কিছু না। আনিকার বাপ মারা যাওয়ার পর থেকে আনিকার মা এখন প্রায়ই অজ্ঞান হন বা অজ্ঞানবস্থাতেই থাকেন।

ড. মুজাম্মেলকে আনিকা বিয়ের দিনই দেখে। তার চেয়ে বিঘৎখানেক বেঁটে গাট্টাগোট্টা মানুষটিকে দেখে সে চোখ বন্ধ করে ফেলে। এতে অবশ্য ছন্দপতন হয় না। ড. মুজাম্মেলের মানসিক সমস্যা ঘটার সম্ভাবনা তৈরি হয় না যেহেতু নববধূ চোখ বন্ধ রাখতেই পারে। আর আনিকা মেনে নেয় সে একটু বেশিই ঢ্যাঙা। তার মনে আছে বড় মামা একবার মাকে বলেছিল, তোর মায়াটা এমন ঢ্যাঙা হইতেছে এই বাইট্টার দেশে অর জন্য পাত্র পাওয়াই তো সমস্যা হইব। আনিকার অবশ্য এ নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল না। পত্রিকা পড়ে পড়ে সে জেনে গিয়েছিল লম্বা হলে মডেল হওয়ার চান্স পেতে সহজ হয়। সে স্বপ্ন দেখত এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে ঢাকায় চাচার বাসায় গিয়ে সে লাক্স ফটো সুন্দরী প্রতিযোগিতায় নাম লেখাবে। সে আর হল না তবে সংসার বেশ আনন্দ নিয়েই শুরু হল। আনন্দ কারণ এই প্রথম অনটনহীন জীবন দেখল সে। যা কিনতে ইচ্ছে করে কেনা যায়, ভাল্ল বোনদের আবদার মেটানো যায়। তার বেশ ভাল লাগে এসব। ড. মুজাম্মেল জাপানেও ঘুরিয়ে আনল একবার। তারপরে বলল পড়াশুনা শুরু করতে। গান শেখার ব্যবস্থাও করল। সম্ভবত এতবড় স্কলারের শুধুমাত্র সুন্দরী স্ত্রীতে মর্যাদা রক্ষা হয় না।

ড. মুজাম্মেল ছাত্র পড়ানো ও আর নিজের পড়ায় ব্যস্ত হলেন, আনিকা ভাইবোনদের অভিভাবকত্ব আর সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ত্রুটিহীনভাবে সংসার টেনে নেয়ায়। কেবল রাতে যেদিন ড. মুজাম্মেল রোমান্টিক হয়ে ওঠেন সেদিন খেদের সঙ্গে একটি মন্তব্য উচ্চারিত হয়, এই বয়সে এত শীতল তুমি! তোমার ফিগার দেখলে ভাবাই যায় না এমন পাথরের মত পড়ে থাকো। নিস্তরঙ্গ সংসারে এটুকু অসন্তোষ কালো মেঘ হয়ে ঝড় তোলে না বরং বুদবুদের মত দ্রুতই মিলিয়ে যায় কারণ এরপর তিনি নিজেই আবার বলেন, বাংলাদেশের মেয়েরা অবদমন করতে করতে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। আনিকা অবশ্য খুব তাড়াতাড়ি রেহাই পেয়ে গেল। যেহেতু ড. মুজাম্মেলের তাড়া তাই সন্তানও চলে এল একবছর পরেই। ড. মুজাম্মেলের জীবন কেন্দ্রীভূত হল ছাত্র ও কন্যায়।

তিনজনের সংসারে একদিন সিফাত আসে খুব স্বাভাবিকভাবে, সংসারের নিয়মে। কিন্তু ওর মুখোমুখি আনিকা আমূল কেঁপে ওঠে কোন পূর্বাভাস ছাড়াই। সিফাত আনিকারই বয়সী অথবা সামান্য ছোট বা বড়। মেডিক্যাল কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। একবছর আগে ওকে ভর্তি করে ওর বাবা ড. মুজাম্মেলের লতাপাতায় ভাই বা ভাই কম বন্ধু বেশি সিফাতের বাবা আনিকাদের ইউনিভার্সিটির প্রফেসর কোয়ার্টারে এসেছিলেন ছেলের খোঁজখবর রাখার দায়িত্ব ড. মুজাম্মেলকে বুঝিয়ে দিতে। ছেলেকে আনেননি কেন ড. মুজাম্মেলের জিজ্ঞাসায় তিনি বিব্রত হেসে বলেছিলেন, বন্ধু পেয়ে গেছে একজন। তার সঙ্গে শহর চিনে নিচ্ছে। আমাকে বলল, তুমি যাও আঙ্কেলের বাসায় আমি একাই যেতে পারব; শহরটা চেনা হয়ে গেলে। আনিকা বলেছিল, বিশ্ববিদ্যালয় তো শহরে না গ্রামে। তিনি হেসে ফেলে বলেছিলেন, না না ও আসতে পারবে। কঠিন কিছু তো না, বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেনে উঠে বসলেই হল।

সিফাতের অবশ্য সহসা ট্রেনে উঠে বসা হয়নি। তবে ড. মুজাম্মেল শহরে গেলে মাঝেমধ্যে মেডিক্যাল কলেজে গিয়েছেন বা ফোনে খোঁজখবর নিয়েছেন। আনিকার কোন যোগ ছিল না তাতে। একবছর পর সিফাত ট্রেনে উঠে বসল কারণ তার হাত ভেঙেছে। হাতের চিকিৎসা অবশ্য মেডিক্যালেই ভাল চলছিল কিন্তু রোজা শুরু হওয়ায় ডাইনিংয়ে খাবারের রুটিন বদলে যাওয়ায় আর ঈদের ছুটির পরে ফাইনাল পরীক্ষা বলে ড. মুজাম্মেলের পরামর্শে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেনে চড়ে বসল। বড় কোয়ার্টারের নিরিবিলি কোণের ঘরটি তার জন্য বরাদ্দ হল আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার তার হাত ড্রেসিং করে দেবে। সুচারু ব্যবস্থা। শুধু আনিকা আর সিফাতের মধ্যে অসহজতার পর্দা ঝুলে থাকে।

আনিকা দরজা খুলে সিফাতের মুখোমুখি হলে মুগ্ধ বিস্ময়ে সিফাত

আনিকাই বরং একদিন চলে আসে এবং তারপর মাঝে মাঝে আসাটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়। একদিন ড. মুজাম্মেলও সঙ্গে আসে। কিন্তু তাতেও তাদের মিলনে বিঘ্ন ঘটে না। সিফাতের বন্ধুরা ড. মুজাম্মেলকে চা খাওয়াতে নিয়ে যায়। ড. মুজাম্মেল তাদের সঙ্গে চা খেয়ে ফেরত আসার সময় সিফাতের জন্য আরো কিছু বিস্কিট চানাচুর নিয়ে আসে। তারপর আনিকাকে নিয়ে সবার কাছ থেকে হাসিমুখে বিদায় নেয়। রাতে সে আনিকার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ আচরণ করে, তাকে বেশি বেশি কামনা করে। আনিকা বুঝতে পারে না লোকটা নিরেট মূর্খ নাকি ধূর্ত!

তাকিয়েই থাকে আনিকাকে ওলটপালট করে। একটু পরে সিফাতের ব্যাগ নিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে ড. মুজাম্মেল 'তোমার আন্টি' বলে আনিকাকে পরিচয় করে দিলে সিফাত বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে একবার ড. মুজাম্মেল এবং একবার আনিকার দিকে তাকিয়ে রক্তিম হয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়। এরপর থেকে ভাববাচ্যে কথা বলে তারা। তবে দু'পক্ষের প্রবল আকর্ষণে নানা ছুঁতোয় সখ্য গড়ে ওঠে সহজেই। এক বিকেলে ক্যাম্পাস ঘুরে দেখতে গিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পাহাড়ের জঙ্গলে ঢুকে যায় এবং ক্লান্তিহীন কথা বলা আর পাহাড় ভাঙার একপর্যায়ে সিফাত হঠাৎ একটি পা আনিকার সামনে দিয়ে পেঁচিয়ে পেছনে নিয়ে আর একটি হাত পেছন থেকে ঘুরিয়ে ওর মুখের ওপর চেপে একইসঙ্গে ওর কথা আর হাঁটা থামালে আনিকা অবাক হয়ে তাকায়। সিফাত ইশারায় চুপ বলে কানে কানে সামনের দিকে তাকাতে বলে, সেখানে পাতার ওপর মৈথুনরত ফড়িঙ দেখায়। নিষ্পলক দেখে তারা ফড়িঙও কী নিষ্ঠায় কী তীব্রতায় মৈথুন সম্পন্ন করে! একটি আরেকটির মাথা কামড়াচ্ছে আর আকুল হয়ে লেজ পেঁচিয়ে ধরছে, একটি যেন আরেকটির ভেতর ঢুকে যাওয়ার জন্য পাগল হয়ে আছে!

সিফাত পা সোজা করে একমাত্র হাতটি দিয়ে আনিকাকে কাছে টেনে ঠোঁট আকড়ে ধরে। ড. মুজাম্মেলকথিত আনিকার পাথরশরীর এক অচেনা অনুভবে জেগে উঠতে থাকে। সিফাতের এক হাত গলায় ঝুলানো কিন্তু তাতে কোন বিঘ্ন ঘটে না, এমনকি কেউ দেখে ফেলার ভয় বা সাপ বিচ্ছুর কামড় সব বিস্মৃত হয়ে আনিকা নিপুণ দড়্গাতায় মৈথুনের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করে। ফেরার পথে সন্ধ্যার আবছা আলোয় অপার ভাললাগা নিয়ে যেখানে চোখ ফেলে তাই তার মনোহর মনে হয়। চেনা মানুষ, পুরনো ক্যাম্পাস সব কিছুর জন্য মায়া লাগে। এমনকি ড. মুজাম্মেলের দিকেও সে হাসিমুখে তাকাতে পারে। আর সেই প্ররোচনায় অথবা নিজস্ব তাগিদেই ড. মুজাম্মেল রোমান্টিক হয়ে উঠলে বরাবরকার মত আনিকা চোখ বন্ধ করে ফেলে প্রবল বিতৃষ্ণায়। কিন্তু সেদিন অদ্ভুত ভাবে সে বন্ধ চোখের পাতার সিফাতের ঠোঁটের স্পর্শ অনুভব করে জেগে উঠতে থাকে তীব্রভাবে। যখন বুকের একপাশে মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়ে ড. মুজাম্মেল এবং চোখ একসময় খুলতেই হয় আর তখনই আবারও আনিকার বিতৃষ্ণা জেগে ওঠে। ইচ্ছে করে বিছানা ছেড়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়; তীব্র আনন্দের সেই অনুভব আবারো ফিরিয়ে আনে, আরো কিছুক্ষণ বুঁদ হয়ে থাকে। কিন্তু ড. মুজাম্মেলের ঘুম ভাঙতে পারে ভেবে নিশ্বাস পর্যন্ত সাবধানে নেয় সে। এই মুহূর্তে তার সঙ্গে একটি বাক্যও বিনিময় অসম্ভব যেন।

পরদিন সকাল থেকেই সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ বিশ্লএকুশ বছ রের দুই তরুণ্লতর ৺ণীর পায়ে নুপুর বাজতে থাকে। নানা ছুঁতোনাতায় পরস্পরের মুখোমুখি, চোখাচোখি, ছোঁয়াছুয়ি অদম্য হয়ে ওঠে। শুধু ড. মুজাম্মেলের যাওয়ার অপেক্ষা। তাই নাস্তার টেবিলে ড. মুজাম্মেল সিফাতকে হাতের ব্যান্ডেজ চেঞ্জ করতে তার সঙ্গে যেতে বললে সিফাত বিষম খায়। কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর একটু স্বাভাবিক হয়ে সে জানায়, পানি খেয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকবে। একটু পরে নাস্তা খেয়ে নিজেই ড. মুজাম্মেলের চেম্বারে চলে যাবে। ক্লাশের দেরি হয়ে যাবে বলে ড. মুজাম্মেল আর দেরি করে না। সিফাতকে রেস্ট নিতে বলে। তারপরে জিজ্ঞেস করে তুমি নিজেই যেতে পারবে তো নাকি আমি আসব? সিফাত তাড়াতাড়ি ঘাড় নেড়ে জানায় সে নিজেই যেতে পারবে।

একদিন সিফাতের হাত ভাল হয়ে যায়, আরেকদিন ছুটি শেষ হয়। তখন সিফাতকে ফিরতেই হয় সাপ্তাহিক ছুটিতে চলে আসবে কথা দিয়ে। কিন্তু কলেজ খুলতেই পরীক্ষার বিভীষিকা। পুরো বন্ধ লেখাপড়া হয়নি। তাই আনিকার সঙ্গে আর যোগাযোগ হয় না ঠিকঠাক। আনিকাই বরং একদিন চলে আসে এবং তারপর মাঝে মাঝে আসাটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়। একদিন ড. মুজাম্মেলও সঙ্গে আসে। কিন্তু তাতেও তাদের মিলনে বিঘ্ন ঘটে না। সিফাতের বন্ধুরা ড. মুজাম্মেলকে চা খাওয়াতে নিয়ে যায়। ড. মুজাম্মেল তাদের সঙ্গে চা খেয়ে ফেরত আসার সময় সিফাতের জন্য আরো কিছু বিস্কিট চানাচুর নিয়ে আসে। তারপর আনিকাকে নিয়ে সবার কাছ থেকে হাসিমুখে বিদায় নেয়। রাতে সে আনিকার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ আচরণ করে, তাকে বেশি বেশি কামনা করে। আনিকা বুঝতে পারে না লোকটা নিরেট মূর্খ নাকি ধূর্ত! এমন একটি অবস্থায় ড. মুজাম্মেলকে আনিকার ধর্ষক মনে হয়। সে ড. মুজাম্মেলকে আসে পাশে ঘেঁষতে দেয় না ড. মুজাম্মেল ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত মেয়েকে ছাড়ে না। তবে বিরক্ত লাগলেও সিফাতে ডুব দিলেই সব যন্ত্রণার উপসম ঘটে তার।

আনিকা সিফাতের উৎসাহে আবার পড়াশুনা করে, ভোরে ঘুম থেকে উঠে রেওয়াজ করে, যোগব্যায়াম করে করে ফিগার আরো ধারালো করে তোলে, নতুন নতুন রান্না শেখে আর রান্না করে বাটিতে ভরে মাঝে মাঝেই ট্রেনে চেপে শহরে চলে আসে সিফাতকে খাওয়ানোর জন্য। কোথাও কোন ছন্দপতন ঘটে না। তবু একবছর পর সিফাত ময়মনসিংহ মেডিক্যালে ট্রান্সফার হয়ে যায়। সিফাত নয়, ড. মুজাম্মেলের কাছ থেকে আনিকা প্রথমে জানতে পারে। সাথে এও জানে যে সিফাতের বাবা এখানে ভর্তি করার পর থেকেই নাকি চেষ্টা করছিল। তো এতদিনে সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু আনিকা এখন কী করে? প্রবল অভিমানে, অপমানে সে সিফাতকে ফোন করে না, সিফাত ফোন করলেও ধরে না ক'দিন। এরপর যদিও বা ধরে উন্মত্তের মত ঝগড়া করে সিফাতকে কিছু বলতে না দিয়েই। সিফাতের অনেকগুলো নতুন বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করে সে। সেগুলো দু'একটি করে ছুঁড়ে দিতে দিতে জানায় সে জানত সিফাত এমনি। এসব ছেলেদেরকে খুব চেনে সে। তারপর হতভম্ভ হয়ে লক্ষ্য করে, সে চিৎকার করলে সিফাতও চিৎকার করে। ড. মুজাম্মেলের মত কুঁকড়ে যায় না, মাফ চায় না, তাকে শান্ত করার চেষ্টা করে না এমন কী 'সরি'ও বলে না। কিছুক্ষণ তুমুল ঝগড়া করে দু'জনে তারপর সিফাতই ফোন কেটে দেয়। আনিকা কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে ফোনটা চোখের সামনে ধরে রাখে, তারপর ছুঁড়ে ফেলে কাজের মেয়ের কোল থেকে মেয়েকে নেয় এরপর হাঁটতে থাকে ক্যাম্পাসের দিকে। তার মনে হয় ড. মুজাম্মেলই তাকে ভালবাসে, স্লেই তার আশ্র্য়। এখন থেকে সে মন দিয়ে সংসার করবে, স্বামী সেবা করবে। কিন্তু কিছুক্ষণ হাঁটার পর তীব্র বিতৃষ্ণায় তার হাঁটার গতি কমতে থাকে। সুস্থভাবে আরো কিছুক্ষণ হেঁটে সে উল্টো পাশে ফেরে। চারদিকে তাকিয়ে সব তার পুরনো আর বিবর্ণ লাগে। তার ইচ্ছে হয় পালিয়ে যেতে এবং তখনই আরো একবার অনুভব করে তার যাওয়ার কোন জায়গা নেই।

শাহনাজ নাসরীন
তরুণ কথাকার

অনুবাদ গল্প

অপরের সুখ

যশপাল

সূর্য উঠেছে কি ওঠেনি– বোঝা যায় না। সারা আকাশ মেঘে ঢাকা। ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে হাওয়া বেশ জোরে বইছে। পাঠানকোট স্টেশনের ওয়েটিং রুমে পাহাড়মুখো যাত্রীরা গায়ে অনেক জামাকাপড় চাপিয়ে লরি ছাড়বার প্রতীক্ষায়। যাত্রীর খোঁজে লরির ড্রাইভাররাও এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে। যাত্রীদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছবার যত না চিন্তা, তার চেয়ে বেশি চিন্তা এই লরি ড্রাইভারদের যাত্রীদের ঠিকমত পৌঁছে দেবার।

স্টেশনের জনমানবহীন লম্বা প-্লাটফর্মে মাঝেমধ্যে এক-আধটা কুলি নজরে পড়ে। ভারী গরম সুট আর ওভারকোট চাপিয়ে মিস্টার সেঠী প-্লাটফর্মের একধারে পাথর-বাঁধানো জায়গাটায় পায়চারি করছেন। ঠাণ্ডা পাহাড়ী হাওয়ায় যাত্রীদের হাড়ে কাঁপুনি ধরছে। মিস্টার সেঠীর কিন্তু এই হাওয়া বেশ ভাল লাগে। সারা দেহ গরম জামাকাপড় দিয়ে মোড়া। হাওয়া ঢোকবার জো নেই। এমনি একটা শান্তিময় পরিবেশে তিনি ভাবেই বিভোর।

লরির ড্রাইভাররা শিকারের সন্ধানে ওয়েটিং রুমের আশেপাশে ঘুরঘুর করছে। জানলার জালের ভেতর দিয়ে মোটর গাড়ির ড্রাইভাররা কে কে তাদের আসামী হতে পারে, তাই আন্দাজ করতে মশগুল। ড্রাইভারদের মধ্যে একজন এগিয়ে মিস্টার সেঠীকে কায়দামাফিক সেলাম ঠুকে বলল, 'হুজুর, গাড়ি খুব কাম্‌ফর্টেব্‌ল্‌'।

ল্যাম্প পোস্টের গায়ে হেলান দিয়ে সেঠী যুবতী ও ছেলেটিকে তন্ময় হয়ে দেখতে থাকেন। স্টেশনের শেষপ্রান্তে গিয়ে যুবতী ফিরলেন। ফেরার সময়ে শিশুটিকে হাত পালটিয়ে বাঁ-হাত থেকে ডান হাতে নিয়ে সেঠীর দিকে এগিয়ে যান। লতার গায়ে ফল যেমন আপন শোভা নিয়ে ঝুলে থাকে তেমনি শিশুটি তার মায়ের প্রাণপ্রাচুর্য নিয়ে ফিরছিল। মা ছেলের হাত ধরে এগিয়ে আসছেন, সেঠীর দৃষ্টিতে তাঁরা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছিলেন। যুবতীর ফর্সা রং, ছিপছিপে গড়ন, সুন্দর স্বাস্থ্য, বড় বড় চোখ।

সেঠী কোনও জবাব দিলেন না। আপন মনে তিনি ঠাণ্ডা হাওয়া উপভোগ করছিলেন। উত্তর দিয়ে নিজের এমন স্বাচ্ছন্দ্যটা খোয়াতে নারাজ। তাছাড়া, গাড়িতে জায়গা না পাবার কোনও সমস্যা তাঁর নেই। গাড়িতে জায়গা খোঁজার তাই কোনও প্রয়োজনও নেই। গাড়িই তাঁর পেছনে ঘোরে। ড্রাইভার দূরে দাঁড়িয়ে থাকে সাহেবের হুকুমের অপেক্ষায়, সেঠীর সেদিকে কোনও ভ্রূক্ষেপও নেই।

মেয়েদের ওয়েটিং রুমের দরজাটা খুলে গেল। লম্বা কালো কোট আর সাদা শাড়ি পরে এক তরুণীকে সেঠী বেরিয়ে আসতে দেখলেন। বছর দুয়েকের একটি ছেলের আঙুল ধরে মেয়েটিকে খালি প্ল্যাটফর্মের অন্যদিকে পায়চারী করতে দেখলেন।

শান্ত এই পরিবেশে সেঠীর মনে হঠাৎ এক প্রশ্ন জাগল। ছোট ছেলেটির আঙুল ধরে যুবতীকে পুবদিকে যেতে দেখে সেঠীর মনে হল যুবতী যেন সফল জীবনের এক জীবন্ত প্রতিমূর্তি। মনে হল নিজের জীবন যেন নিষ্প্রয়োজন। ঠিক যেন এক টুকরো বর্ষণরিক্ত মেঘের ভেসে যাওয়া। যুবতীর জীবন যেন একটি সজল মেঘ, বৃষ্টির ধারায় নেমে এসে শস্যশ্যামলা খেতে ছেয়ে আছে। মায়ের আঙুল ধরে ঝুলে ছোট গোদা গোদা পায়ে ছেলেটি নড়বড় করতে করতে চলেছে, পাশে মা শান্ত, স্থির ও গাম্ভীর্য নিয়ে হেঁটে চলেছেন; যেন পণ্যেভরা বাণি জ্যের তরী– শান্ত, স্থির জলের ওপর দিয়ে আপন ঐশ্বর্যভরে বয়ে চলেছে।

ল্যাম্প পোস্টের গায়ে হেলান দিয়ে সেঠী যুবতী ও ছেলেটিকে তন্ময় হয়ে দেখতে থাকেন। স্টেশনের শেষপ্রান্তে গিয়ে যুবতী ফিরলেন। ফেরার সময়ে শিশুটিকে হাত পালটিয়ে বাঁহাত থেকে ডান হাতে নিয়ে সেঠীর দিকে এগিয়ে যান। লতার গায়ে ফল যেমন আপন শোভা নিয়ে ঝুলে থাকে তেমনি শিশুটি তার মায়ের প্রাণপ্রাচুর্য নিয়ে ফিরছিল। মা ছেলের হাত ধরে এগিয়ে আসছেন, সেঠীর দৃষ্টিতে তাঁরা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছিলেন। যুবতীর ফর্সা রং, ছিপছিপে গড়ন, সুন্দর স্বাস্থ্য, বড় বড় চোখ। শিশুটির সারা গায়ে রক্তিম আভা, ফোলা গাল, ছোট নাক, গোল গোল চোখ। সেঠী চশমার ভেতর দিয়ে চোখ মেলে চাইলেন। নির্মল শীতল হাওয়ায় পরম শান্তি লাভের কথা আর মনে থাকে না।

গাড়ির ড্রাইভার মেমসাহেবকে সেলাম ঠুকে কাছে এসে দাঁড়ায়। একটু পরে এক লরিড্রাইভার সেলাম ঢুকে ফিসফিস করে কি যেন বলে।

সেঠী ব্যবসাদার। ওঁর মনে হল মেমসাহেব সস্তায় ভাল গাড়ির খোঁজে আছেন। লরি সাতটার আগে ছাড়বে না। কারের যাতায়াতের ব্যাপারে সে রকম কোনও কড়াকড়ি নেই। লরির যাত্রীদের অপেক্ষা করতে হয়, কেননা লরির রা স্তা তখনও বন্ধ। কারের যাত্রীরা অপেক্ষা করেন, তাঁদের যাবার তাড়া নেই বলে। সেঠীর হঠাৎ একটা কথা মনে হয়। ল্যাম্প-পোস্ট ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সেঠী ড্রাইভারের দিকে তাকাল। ড্রাইভার দৌড়ে সামনে হাজির হয়ে দ্বিতীয়বার সেলাম ঠোকে। সেঠী জিজ্ঞেস করলেন, 'গাড়ির কন্ডিশান ভাল তো?'

'হুজুর একেবারে নিউ,... অস্টিন, সেলুন।'

'আচ্ছা।'

'হুজুর, আর কোনও যাত্রী তো নেওয়া যাবে না?'

'না, সোজা যাবে...। তোমার যদি ফালতু দু'চার টাকা লাভ হয় তো আর এক আধজন যাত্রী নিতে পার।'

ড্রাইভার আবার লম্বা সেলাম ঠুকল। ওয়েটিং রুম থেকে সেঠীর মালপত্তর বার করে আনে। তিনটে বড় সুটকেস, একটা বড় হোল্ডল আর ছোটখাট কয়েকটা এটাচিকেস। আরও একজন বাড়তি যাত্রী নিতে পারবে জেনে ড্রাইভার তাড়াতাড়ি মেমসাহেবকে এক সেলাম ঠুকে অল্প পয়সায় রফা করে নিল।

সেঠী সবই লক্ষ্য করলেন। মেমসাহবের সামান্য জিনিসপত্তর ওয়েটিং রুম থেকে বার করা হল। একটা মাত্তর সুটকেস ও একটা হোল্ডল। ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে যুবতী সেঠীর পিছু পিছু কারের দিকে এগোলেন। পেছনের সীটে না বসে সেঠী ড্রাইভারের পাশে বসে পড়লেন। মেমসাহেব ও তাঁর ছেলে পেছনে।

ঠাণ্ডা হাওয়ার বুক চিরে গাড়ি এগিয়ে চলল। পেছনের সিটে কেউ বসে আছে ভেবে সেঠীর বেশ একটা আত্মতৃপ্তি। গাড়ির পুরো ভাড়া দেওয়া সত্ত্বেও সামনের ছোট সিটে বসতে সেঠীর কোনও বিরক্তিই ধরল না। চলতি গাড়ি থেকে রাস্তার দু'পাশের গাছ আর বাড়ি দেখে ছেলেটি সামনের সিটটা ধরে লাফালাফি শুরু করে দেয়। ছেলেটির লাফালাফিতে কখনও সেঠীর টুপি মাথা থেকে সরে যায় কখনও বা ছেলেটির মাথা তাঁর হাতে ঠোক্কর খায়।

ছেলেটির দুষ্টুমিতে মা একটু সঙ্কোচ বোধ করেন। ছেলেটিকে চুপচাপ থাকতে বলে ধমক দেন। সেঠী আর সেই সঙ্গে ছেলেটি– দু'জনেই হেসে ফেলে। ছেলেটি সামনের সিটে যাবার জন্যে লাফ দিতে যায়। পেছন ফিরে ছেলেটিকে তুলে নিয়ে সেঠী নিজের কোলে বসিয়ে নেন। ছেলেটির নরম গোলগাল দেহের স্পর্শে সেঠীর মনে এক অদ্ভুত অনুভূতি জাগে। তাঁর মন নতুন এক চেতনায় ভরে যায়। কষ্ট করে ঘাতপ্রতিঘাতে ভরপুর এত দিনের এই জীবন সেঠীর হঠাৎ যেন অনাবশ্যক ও নিষ্ফল মনে হয়। ছেলেটির মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে সেঠী কি যেন একটা অভাব বোধ করেন।

মোটরের সামনে চলমান দৃশ্যের পটভূমিকায় সেঠী নিজের জীবন চলচ্চিত্রের মত দেখতে পান। পিতার মৃত্যুর পর বাধ্য হয়ে তাঁকে এফএ পড়া ছেড়ে দিতে হয়। জীবিকা অর্জনের কোনও পথ খুঁজে না পেয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। শেষে এক ঠিকাদারের কাছে মাসে কুড়ি টাকা মাইনেতে চব্বিশ ঘণ্টা হাড়ভাঙা খাটুনির এক কাজ জোটে। সব কথা তাঁর মনে পড়ে। তিনি নিজে একদিন ঠিকায় ঠিকাদারের কাজ করেছেন। একটার পর একটা কাজ ঠিকায় নিয়েছেন, দিনরাত খেটেছেন। একদিন তাঁকে টাকার জন্যে দোরে দোরে ভিক্ষে করতে হয়েছে, আর আজ সেই টাকা লাখে লাখে তিনি নাড়াচাড়া করেন। রেলের ঠিকাতে একবার একসঙ্গে আড়াই লাখ টাকা লাভ...।

সেঠী জীবনে একটা জিনিসই চিনেছেন– শুধু টাকা। রোজগারের ধান্ধায় তিনি রাতদিন কিছুই গ্রাহ্য করেননি। আজ তিনি লাখপতি। নিজের রোজগারের টাকা দিয়ে তিনি বড় বড় কোম্পানির শেয়ার কিনেছেন। পকেটে ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের চার আঙুল চওড়া বড় চেক বই। ইচ্ছে করলে চেক কেটেই তিনি আজ সব কিছু করতে পারেন। কিন্তু অর্থ ছাড়া জীবনে আর কিইবা পেয়েছেন? টাকা দিয়ে কি না পাওয়া যায়? ওঁর আত্মীয়-স্বজন– যাদের উনি চেনেন না, যাদের চেনা প্রয়োজনও মনে করেন না– তারা আজ ওঁর নাম করে নিজেদের পরিচয় দেয়। ওঁর জন্যে সবার দরদ উথলে ওঠে। সম্মানও তিনি কম পাননি। রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁকে পৃষ্ঠপোষক বা সভাপতি করার জন্যে উন্মুখ। কিন্তু এতে ওঁর কতটুকুই বা লাভ হয়েছে?

তাঁকে কেন্দ্র করে প্রেম ও প্রণয়ের কত অভিনয়ই না হয়েছে। এদের সলজ্জ ও মুগ্ধ নয়নে ওঁর অর্থের প্রতি লোভ কেবলই ফুটে উঠতে

চারিদিকে মেঘ ঘনিয়ে আসে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির একটা আমেজ। গাড়ির কাচে বিন্দু বিন্দু জমা জল আস্তে আস্তে গড়িয়ে পড়ছে। ওয়াইপার নিঃশব্দে কাচ থেকে জল সরিয়ে দিচ্ছে। ভেতর থেকে ছেলেটি ওয়াইপারটাকে বারবার ধরার চেষ্টা করে। সেঠী শিশুর নিটোল হাত দুটো ধরে আছেন। হাতটা ছেড়ে দিতে তাঁর মন চাইছে না। ছেলেটি ঘুরে একবার সেঠীর দিকে তাকায়। সেঠীর নেকটাই-এর স্টোন সেটিং পিন তার নজরে পড়ে। এবার ছেলেটি এগুলি ধরবার চেষ্টা করে।

দেখেছেন। এগুলো কেবল ওঁকে ফাঁসাবার চেষ্টা– দেখেশুনে উনি সাবধান হয়ে গেছেন। তাই কেউই ওঁকে আকর্ষণ করতে পারেনি। গুড়ের নাগরীর চারিদিকে মাছি আর বোলতা ভন ভন করলে যেমন তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়, সেঠী তেমনি এদেরও তাড়িয়েছেন। কারণ, তখনও ওঁর ছিল কেবল টাকা রোজগারের নেশা।

আজ তাঁর টাকার অভাব নেই, তবুও তিনি সমানে রোজগার করে চলেছেন। টাকা বাড়িয়ে যাওয়াটাই তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। বৃষ্টির সময় যেমন ছোট ছোট খালবি লের জল নদীতে এসে জড় হয়, তেমনি তাঁর হাতে টাকাও আসে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শত শত ব্যবসায় হাজার হাজার লোক খেটে টাকা আমদানি করছে আর সেই টাকা ব্যবসার খাত বয়ে সেঠীর হিসেবের খাতায় জমা হচ্ছে। তাঁর কাজই হচ্ছে টাকা বইয়ে আনার নিত্যনতুন পথ আবিষ্কার করা।

নিজের খরচার কোনও চিন্তাভাবনা নেই। নিজের সখআহ্লাদ বলেও কিছু নেই। তিনি নিঃসঙ্গ, খরচ করবেনই বা কিসে? নিজের খরচ কোনও মাসেই হাজারবা রোশোর বেশি হয় না। নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে কোন দিনই তাঁর খেয়াল নেই। হঠাৎ আজ ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় তাঁর মনে এক নতুন অনুভূতি জাগল– কিসের যেন একটা অভাব তিনি অনুভব করেন।

ছেলেটি জুতোশুদ্ধ পা তাঁর দামী কোটের ওপর চাপিয়ে বরফের মত ঠা-া মোটরের কাচের ওপর হাত রেখে কাচের সঙ্গে মুখটা ঠেকিয়ে আনন্দে খিল খিল করে হাসছিল। ছেলেটি সেঠীর কোলে দাপাদাপি করছিল। সেঠীর কাছে এ এক বিচিত্র সুখানুভূতি। আবেগে তাঁর চোখ ছলছল করে ওঠে, মুখের একটা দিক কুঞ্চিত হয়ে যায়। ছেলেটির শিশু-সুলভ চঞ্চলতা তিনি অনিমেষ নয়নে দেখছিলেন। পেছনে অতি কাছে কারন্নর উপস্থিতি যেন তিনি স্পষ্ট অনুভব করতে পারছিলেন। এক ব্যগ্র বাৎসল্যময় অনুভূতি বৃক্ষের ছায়ার মত যেন তাঁকে পরিবৃত করে ফেলছে, গাছকে জন্ম দেয় যে ফুল এ যেন তারই আকর্ষণ। এ সেই নারী যে সন্তানের মাথায় কল্যাণ ও স্থৈর্যের হাত রেখে পুরুষকে কামনার রাজ্যে নিয়ে যায়। হাসিতে যার সাতরঙা রামধনুর উচ্ছলতা, ভেতরে যার প্রণয়ের কটাক্ষ, রক্ষার আশ্বাস, আশীর্বাদের শ্যামলিমা, আর বাসনার উগ্রতা– সব একেতেই মিলেমিশে আছে। একজন চুম্বকের মত নিয়ে যাচ্ছে নৈসর্গিক চেতনায় অন্যজন ঠেলে দিচ্ছে বাস্তবের চাহিদায়। এইরকম একটা অনুভূতির ঘূর্ণিপাকে তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। বিদ্যুৎ তরঙ্গের মত একটা শিহরন শরীরে ঘুরপাক খেতে লাগল।

গাড়ি ক্রমশ পাহাড়ের গা বেয়ে এগিয়ে চলেছে। ঠাণ্ডাও সমানে তীব্র হয়ে উঠছে। চারিদিকে মেঘ ঘনিয়ে আসে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির একটা আমেজ। গাড়ির কাচে বিন্দু বিন্দু জমা জল আস্তে আস্তে গড়িয়ে পড়ছে। ওয়াইপার নিঃশব্দে কাচ থেকে জল সরিয়ে দিচ্ছে। ভেতর থেকে ছেলেটি ওয়াইপারটাকে বারবার ধরার চেষ্টা করে। সেঠী শিশুর নিটোল হাত দুটো ধরে আছেন। হাতটা ছেড়ে দিতে তাঁর মন চাইছে না। ছেলেটি ঘুরে একবার সেঠীর দিকে তাকায়। সেঠীর নেকটাইএর স্টোন সেটিং পিন তার নজরে পড়ে। এবার ছেলেটি এগুলি ধরবার চেষ্টা করে। সেঠী পিনটা খুলে শিশুর কোটে লাগিয়ে দিলেন ও তাঁর ফিকে সরবতি রঙের সান গাসটা তাকে পরিয়ে দেন। শিশুর মুখের প্রায় অর্ধেকটা ঢেকে গেল। সেঠী চশমার কাচের প্রতিফলনে দেখতে পেলেন পেছনের সিটে শিশুটির মা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে শিশুকে চুপচাপ থাকার ইসারা করছেন। পেছন ফিরে ঘাড় বেঁকিয়ে সেঠী মার দিকে তাকালেন। শিশুর হয়ে বলে ওঠেন, 'ঠিক আছে, আপনি কিছু চিন্ত্মা করবেন না।' ওঁর মুখে স্নান হাসি দেখে মার হৃদয় বিগলিত হয়।

ড্রাইভার গাড়ির গতি কমিয়ে বিনয়ের সঙ্গে বলে, 'হুজুর, ওপরে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, সামনে কুয়াসাও ভীষণ।' জবাবে সেঠী বলেন, 'হ্যাঁ, ঠিক আছে।' পাহাড়ের ওপর থেকে বৃষ্টির ধারা ঝরনার মতন নেমে এসে রাস্তার দুধার দিয়ে বয়ে চলেছে। গাড়ির চাকা জল কাটতে কাটতে চারিদিকে ফোয়ারার মত জল ছিটিয়ে ঘুরে ঘুরে পাকদণ্ডী রাস্তা দিয়ে ওপরের দিকে উঠছে। বিজ্ঞানের অভিনব আবিষ্কার এই মোটরগাড়ি, পাহাড়ের খাড়া চড়াই, ঘন কুয়াসা আর বৃষ্টির জলের ঝাপটা অনায়াসে অতিক্রম করে পাহাড়ের বুকে ছুটে চলেছে।

এক নাগাড়ে দুঘ ণ্টা চলে গাড়ি মাঝপথে এক ডাকবাংলোয় এসে থামল। ডাকবাংলোর গাড়িবারা ন্দার তলায় এসে দাঁড়াল। ডাকবাংলোর বাইরে অনেক যাত্রী টিন আর খড়ের চালার তলায় আধো ভেজা অবস্থায় বসে। পাহাড়ী মালবাহী ষাঁড় ও খচ্চর এখানেওখা নে জলে ভিজে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে মানুষের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সেইসঙ্গে নিরুৎসাহ লক্ষ্য করছে। যাত্রীরা সরকারের হুকুম আর শেষমেশ বৃষ্টির অবস্থা কি দাঁড়ায় তা দেখার জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করছে। ভারবাহী পশুরা যাত্রীদের আজ্ঞার অপেক্ষায়। সারারাত অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি হওয়ায় পাহাড়ের বেশ কয়েক জায়গায় ধস নামায় এগোবার রাস্তা বন্ধ। যাত্রীদের যাতায়াত মানা।

ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে দিল, সেঠী নামলেন। তাঁর আঙুল ধরে শিশুটিও। তারপর মেমসাহেব। ডাকবাংলোর চাপরাশি ও খানসামা গাড়ি দেখে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল। কায়দামাফিক উর্দিপরা খানসামা জলখাবারের কথা জিজ্ঞেস করল। সেঠী 'হ্যাঁ' বলে সম্মতি জানান।

ছেলের জন্যে মেমসাহেব ঝুড়িতে দুধের বোতল নিয়ে এসেছিলেন। নিজের জন্যে তাঁর বিশেষ কিছু প্রয়োজন ছিল না। ষাট টাকা মাইনের মাস্টারনীর ডাকবাংলোয় জলখাবার খাওয়া পোষায় না। বারান্দার আরাম কোদারায় বসে মেমসাহেব সেঠীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে শিশুটিকে দুধ খাবার জন্যে 'বলু'- বলে ডাক দেন।

সেঠীও মেমসাহেবের দিকে না তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'বলু-গরম দুধ খাবে।'

টেবিলের ওপর জলখাবার সাজিয়ে খানসামা মেমসাহেবকে খবর দিল। খানসামার ধারণা ওঁরা তিনজনই এক পরিবারের।

খানসামার এইরকম ধারণা মেমসাহেবের অদ্ভুত লাগে। অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। ভদ্রতার খাতিরে সেঠীর দিকে তাকিয়ে বিনয়ের সঙ্গে ইংরেজিতে বললেন, 'আমার কিছু লাগবে না।'

'এত ঠাণ্ডায় এক পেয়ালা গরম চা ভালই লাগবে', সেঠী সাগ্রহে জবাব দিলেন।

জলখাবারের জন্যে সকলে ভেতরে গেলেন। ঐ ঘরে খানসামাই শুধু আনাগোনা করছিল। অপরের দৃষ্টিতে এঁরা স্বামী স্ত্রী ও শিশু সন্তান মিলে একটি ছোট্ট পরিবার। খানসামারও তাই ধারণা, তার সামনে অযথা সঙ্কোচ দেখানোটা মেমসাহেবেরও সমীচীন মনে হল না। নিঃসঙ্কোচে তাই পেয়ালায় চা ঢালতে লাগলেন। সেঠী এক টুকরো অমলেট বলস্নুর মুখে পুরে দিলেন। শিশুটি মহানন্দে অমলেটটা খেতে লাগল।

খানসামা চেয়ারের পেছনে অপেক্ষা করছিল। মেমসাহেবকে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বিস্কুট জ্যাম বা ফল আনব?'

সেঠী উত্তর দিলেন– 'আনো।'

যে সব টিনের খাবার সহজে বিক্রি হয় না, খানাসামা সেগুলির মুখ

মিসেস মদনের হোল্ডলটা একটা ঘরে খোলা হল। তিনি সে ঘরে চলে গেলেন। শিশুটির কখনও বা ওঘরে আবার কখনও সেঠীর কাছে যাওয়া-আসা লেগে থাকে। মিসেস মদন উঠে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেঠীর মনে হল পাছে তিনি বেশি খেয়ে ফেলেন এই ভয়ে কে যেন তাঁর সামনে থেকে খাবারের থালাটা ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল। কিন্তু খিদে যে এখনও মেটেনি। সেঠী ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে আকাশে ভেসে যাওয়া মেঘগুলো দেখছিলেন, কখনও বা বারান্দায় পায়চারি করছেন, আবার এসে বসছেন।

খুলে পেটে সাজিয়ে নিয়ে টেবিলে হাজির করল। সেঠী সারাক্ষণই হাসছিলেন। শিশুটিকে একটু একটু করে সব জিনিসই খেতে দিচ্ছিলেন। শিশুটির মহাস্ফূর্তি দেখে মা ভাবে গদগদ হয়ে বলে ওঠে, 'অনেক হয়েছে। আর দেবেন না, ও আর খেতে পারবে না।' এইভাবে তিনি সেঠীকে বাধা দেবার চেষ্টা করেন।

শিশুটিতে কেন্দ্র করে সেঠী সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠে ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কি ড্যালহৌসিতেই থাকেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি মিসেস মদন। মিস্টার মদন মিলিটারি একাউন্টস অফিসে কাজ করেন। আমি স্কুলে পড়াই। অমৃতসরে বোনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।'

সেঠী নিজের কী বা পরিচয় দেবেন? তাই শুধু বললেন, 'খুব ভাল কথা।' নিজের সম্বন্ধে বলার মত কিছুই খুঁজে পেলেন না। নিজের জীবনটা নিতান্তই জোলো, রসকসহীন ঠেকছিল তাঁর কাছে।

'আপনি কি ড্যালহৌসিতে গরমে বেড়াতে যাচ্ছেন?' মিসেস মদনের প্রশ্ন।

'না, ব্যবসার কাজে কিছুদিন থাকব। ড্যালহৌসি জায়গাটা বেশ। বেশ কেন, খুবই ভাল। চমৎকার দৃশ্য।'

'আপনি ছেলেপুলেদের সঙ্গে আনেননি?' যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে মিসেস মদন শুধালেন।

'না... আমার... মানে... নেই...। আমি বিয়েই করিনি। আমার নাম আর এল সেঠী। পেশা ঠিকাদারী। অমৃতসরের নতুন গির্জাটা আমারই করা।' চায়ে চামচ নাড়াতে নাড়াতে দেওয়ালের দিকে মুখ করে তিনি বললেন, 'আমি একলাই থাকি।'

সেঠীর কথা শুনে মিসেস মদনের মন বেদনার্ত হয়ে ওঠে। মনে মনে ভাবতে থাকেন, কত বড়লোক, অথচ কত সরল।

বলুস্ন সেঠীর চামড়ার স্ট্র্যাপ দেওয়া সোনার ঘড়িটাকে টেবিলের ওপর ঘসছিল। মিসেস মদন বলুকে আঙুল দেখিয়ে বলেন, 'উহুঁ, ও রকম করে না।' তারপর সেঠীর দিকে তাকিয়ে অনুযোগের সুরে বলেন, 'ভীষণ দুষ্টু, দেখছেন...।'

সেঠী তাঁর চুলে বিলি কাটছিলেন– চিন্তার জট ছাড়ানো আর কি। অনেক কিছু পেয়েও খোঁড়া মানুষের মত জীবনটা যেন অর্থহীন মনে হয় সেঠীর। সামনে টেবিলে কনুই ভর দিয়ে মিসেস মদন শিশুটিকে দেখছিলেন। তাঁর স্বচ্ছ মসৃণ মুখ যেন জ্বলজ্বল করছে। ডাগর চোখ, শাড়ি মাথা থেকে সরে যাওয়ায় দেখা যায় মাথাভর্তি সুন্দর চুল, গোলাপী ঠোঁট, কোটের কলারের ফাঁকে তাঁর গলার খানিকটাও দেখা যাচ্ছে। সেঠীর কাছে এসব একটা পরিপূর্ণ জীবনের ছবি, যেটা তাঁর গণ্ডীর বাইরে।

মিসেস মদনের দৃষ্টি সেঠীর চোখের ওপর। অনুভব করেন যেন সেঠীর দৃষ্টি তাঁর শরীরকে আলিঙ্গন করে রয়েছে। একটা শিহরন অনুভব করলেন। এ অনুভূতি পীড়াদায়ক নয়। মিসেস মদনের আচরণে একটা অধিকারের আভাস ফুটে ওঠে। টেবিলের ওপর দুটো হাত রেখে তিনি সেঠীর দিকে নিঃসঙ্কোচে তাকিয়ে বলে ওঠেন, 'মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, আমরা কি করে পৌঁছব?'

পকেট থেকে সোনার সিগারেট কেসটা বার করে সেঠী সিগারেট ধরালেন। দ্বিধাহীন ভাবে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, 'বৃষ্টি নাও থামতে পারে। যদি আমরা আজ নাই পৌঁছতে পারি, তাতেই বা কি এসে যায়?'

একটু যেন চিন্তান্বিত হলেন মিসেস মদন। আঙুলগুলি এমনভাবে নাড়াচাড়া শুরু করলেন যেন ওইগুলি সঙ্কোচের কারণ। মুচকি হেসে বললেন, 'আমায় কাল তো স্কুলে যেতেই হবে। আপনিও কাজে এসেছেন, আপনারও তো কম ক্ষতি হবে না।'

'হ্যাঁ, যে কাজের জন্যে এসেছি সেটা হয়তো হবে না।' বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা খানসামার দিকে তাকিয়ে তিনি ডাক দিলেন, 'এধারে শোন।' খানসামা পেটের ওপর বিল নিয়ে হাজির হল। বিলটা যেন দেখতে পাননি এমনি একটা ভাব নিয়ে মিসেস মদন বললেন– 'ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস কর ক'টা নাগাদ যেতে হবে।'

বিলটা তুলে নিয়ে সেঠী বললেন, 'জানেন, আমি যখন স্কুলে পড়তাম তখন সব সময়েই ভাবতাম কবে স্কুল ছুটি হবে, কারণ যাই হোক না কেন। কোনও একটা ওজরে স্কুল যেতে না হলেই খুশি। কিন্তু আপনার দেখছি উল্টো, স্কুল খুবই ভাল লাগে।'

মিসেস মদন বলেন, 'আপনি বোধহয় দুষ্টু ছিলেন... ভাবছেন, বৃষ্টি পড়লে আর কাজ করতে হবে না। তাই মনে মনে চাইছেন, বৃষ্টি না থামুক আর মনের আনন্দে বেশ সিগারেট টানছেন,' কথাগুলো বলে মিসেস মদন একটু হাসলেন।

'হ্যাঁ, তা তো বটেই।'

'ব্যবসায় আপনার মন লাগে না?'

'একথা কখনও ভাবিইনি। হ্যাঁ, তবে মনে হয় জীবনের গাড়িটাকে একরাশ কাদার মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে চলেছি।'

ড্রাইভার এসে খবর দিল রাস্তা এখনও খোলেনি। সেঠী পুলিশ স্টেশনে ফোন করে খবর নিলেন। ছ'ঘণ্টার আগে রাস্তা খোলার কোনও সম্ভাবনাই নেই।

খবর শুনে মিসেস মদনকে বিচলিত হতে দেখে সেঠী বললেন, 'আপনার স্কুলের লোক বুঝবে রাস্তা মেরামত করা আপনার হাতে নেই।'

মিসেস মদনের হোল্ডলটা একটা ঘরে খোলা হল। তিনি সে ঘরে চলে গেলেন। শিশুটির কখনও বা ওঘরে আবার কখনও সেঠীর কাছে যাওয়াআসা লেগে থাকে। মিসেস মদন উঠে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেঠীর মনে হল পাছে তিনি বেশি খেয়ে ফেলেন এই ভয়ে কে যেন তাঁর সামনে থেকে খাবারের থালাটা ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল। কিন্তু খিদে যে এখনও মেটেনি। সেঠী ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে আকাশে ভেসে যাওয়া মেঘগুলো দেখছিলেন, কখনও বা বারান্দায় পায়চারি করছেন, আবার এসে বসছেন। তাঁর হিসেবী মনে সেদিন যেন কল্পনার রঙিন স্বপ্ন, তাঁর নিজের জীবনেরই ছবি বারবার নিজের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আর টাকা নয়। এবার যেন অন্য কিছুর আকর্ষণ তাঁর কাছে অনেক বেশি। সামনে দুর্গম পাহাড়ে যেন উঠছেন আর চলমান নারী মূর্তিটিকে ধরবার জন্যে প্রলুব্ধ হচ্ছেন। বার বার গা স্পর্শ করতে চাইছেন, কিন্তু নারী মূর্তিটি প্রতিবারেই নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। হাল্কা মেঘে ঢাকা এই নারী মূর্তিটি মিসেস মদন ছাড়া আর কেউ নয়।

পায়চারি করতে করতে তিনি আবার ইজিচেয়ারে বসে পড়লেন। তখন ভিজে ঘাসে আর গাছের মগডালে নতুন সূর্যের বৃষ্টিধোওয়া আলো ছড়িয়ে পড়েছে। হঠাৎ সূর্যের আলোয় সেঠীর চোখ ধাঁধিয়ে গেল। নিজের অক্ষমতা স্পষ্ট বুঝতে পারলেন। উঠে মিসেস মদনের ঘরেও যেতে পারছেন না। কে জানে তিনি এখন ঘুমচ্ছেন না জেগে আছেন। ভাবেন মিসেস মদনের যদি একটু সান্নিধ্য পাওয়া যেত।

মেয়েটির পায়ের জুতোর আওয়াজে সেঠী ফিরে তাকালেন। কোটের পকেটে হাত দুটো পুরে মিসেস মদন এসে বললেন– 'রোদ্দুর তো উঠে গেছে, ছ'ঘণ্টাও প্রায় কেটে গেল। এবার তো আমরা যেতে পারি?...

বলুর কাঁদ-কাঁদ মুখ দেখে মিসেস মদন আঙুল নেড়ে বললেন, 'চুপ, চুপ, মামাবাবু মারবেন।' ছোট্ট এই 'মামা' শব্দ দিয়ে মিসেস মদন সেঠীর সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ নির্ণয় করলেন। নিজের বাপের বাড়ির কথা সব বলতে লাগলেন। কথায় কথায় তাঁর নামটাও জানিয়ে দিলেন– 'ঊর্মিলা।'
বসে বসে সন্ধ্যে গড়িয়ে এল, তারপর রাত্রি গভীর হয়। আকাশে চাঁদ উঠেছে। কাছে চিড় গাছের ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না ওঁদের গায়ে এসে পড়েছে।

ক'টা বাজল?'

ঘড়িটা বলুর কাছেই ছিল। ঘড়ির কাঁটা ও কাচ দুইই ভেঙে গেছে। সময় জানতে হলে ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করা ছাড়া উপায় নেই।

ছ'ঘণ্টা কেটে গেলে কি হবে রাস্তা এখনও ঠিক হয়নি। ওইপথে মোটর চালাবার অনুমতি পাওয়াও সম্ভব নয়।

খানসামা এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল, লাঞ্চের কোনও ব্যবস্থা করবে কিনা জিজ্ঞেস করল।

'মেমসাহেবকে জিজ্ঞেস কর।' সেঠী অন্যদিকে তাকিয়ে শিশুটির আঙুল ধরে রোদের মধ্যে বেরিয়ে পড়লেন।

খানাসামা কি মনে করছে এই কথা ভেবে মিসেস মদনের বেশ সঙ্কোচ হচ্ছিল। কিন্তু সঙ্কোচ প্রকাশ করলে পরিস্থিতি আরও ঘোরাল হয়ে দাঁড়াবে ভেবে দ্বিধাহীন কণ্ঠে বললেন, 'যা হয় কিছু কর... আর দেখ যেন দেরি না হয়।'

সেঠী মিসেস মদনের কাছে বসতে চাইছিলেন, মিসেস মদনের কোনও আপত্তি না থাকলে, অবশ্য। লাঞ্চ খাবার সময় আবার তাঁরা একসঙ্গে বসলেন। নতুন কথা আর কিইবা হবে? কিছু বলতেই হয় ভেবে সেঠী বললেন, পাহাড়ের রাস্তায় প্রায়ই ধস নামে, গতবার সকালে এসে ঘণ্টাতিনেকের মধ্যে কাজ সেরে তিনি ফিরেও গেছিলেন...।

'আপনি ড্যালহৌসিতে কোথায় থাকেন?' মিসেস মদন নিজের ঠিকানার চিরকুটটি হাতে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কতদিন থাকবেন?' সেঠী শুধু কাজ নিয়েই এসেছিলেন। একদিন, দু'দিন, বা তিনদিনও থাকতে পারেন। ড্যালহৌসিতে পল্টনদের জন্যে চুড়েলডা-া পাহাড়ের ওপর নতুন বাড়ি তৈরি হবে, তারই ঠিকের জন্যে তিনি ড্যালহৌসি যাচ্ছিলেন। এর আগে যখন ড্যালহৌসি গিয়েছিলেন তখন 'হিলক্রেস্ট' হোটেলে নেমেছিলেন। এবারেও সেখানেই আস্তানা।

কথার পিঠে মিসেস মদন নিজের জীবনের করুণ কাহিনি শোনালেন। তাঁর স্বামী মাসে একশো টাকা মাইনে পান। উনি নিজে শিক্ষয়িত্রী, মাইনে পান ষাট টাকা মাত্তর। সখের চাকরি নয়, নেহাত দায়ে পড়ে। নিজেদের বাড়ি আছে। স্বামীর শক্ত অসুখ হওয়ায় সাড়ে চার হাজার টাকায় সেটি বাঁধা রাখতে হয়েছে। মরসুমে সেই বাড়ি থেকে দুশোআড়াই শো টাকা ভাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু কোনও লাভ হয় না। কিস্তিতে আরও পঞ্চাশ ষাট টাকা মহাজনকে দিতে হয়।

সেঠী ভাবতে থাকেন সাড়ে চার হাজার টাকা। এ আর এমন কি কথা। কিন্তু তাঁর করারই বা কি আছে। খেতে খেতে দু'জনেই বলুর খেলাধুলো সাগ্রহে দেখছিলেন। সেঠী বলুকে খাইয়ে দিতে চাইছিলেন। কিন্তু মিসেস মদন বলছিলেন, 'বেশি খেতে নেই।' সেঠীর ঘড়িটা বলু-ভেঙে দেওয়াতে মিসেস মদন দুঃখ প্রকাশ করলেন। সেঠী কিন্তু সে কথা কানে তুললেন না। খাওয়া শেষ হল। মিসেস মদন উঠে ভেতরে যাবার উপক্রম করছিলেন। এমন সময় সেঠী সাহস করে বললেন, 'কি আবার শুতে চললেন নাকি?'

'না তো? কিন্তু করবই বা কি? বিকেলের মধ্যে কি আমাদের পৌঁছবার কোনও উপায় নেই?'

'কোনও আশা নেই। আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আপনি কাল যদি স্কুলে না যান তাহলে একদিনের দু'টাকা মাইনেই তো কাটবে, তার বেশি তো কিছু না। আর আমার কাজ না হলে কত ক্ষতি হবে জানেন? ষাট পঁয়ষট্টি হাজার', বলেই সেঠী হেসে ফেললেন। 'আপনি বাড়িটা ছাড়িয়ে নেন না কেন? তাহলে তো আপনার চাকরি করবার দরকার হয় না।'

'কিন্তু ছাড়াব কি করে? আমি মাত্তর এক হাজার টাকা অতি কষ্টে দিতে পেরেছি।

'তাতে কি? আপনি ছাড়িয়ে নিন, টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমার সুদের দরকার নেই। আর, টাকার জন্যেও এমন কোনও চিন্তা নেই।'

মিসেস মদনের চোখ আনন্দে নেচে ওঠে, মুখ আরও রক্তাভ হয়ে যায়। নিজেকে সামলে নিতে বলুকে কোলের ভেতর টেনে নেন। বলুর হাত থেকে ঘড়িটা কেড়ে নিয়ে বললেন, 'এটা আপনি রাখুন, তা না হলে ও হারিয়ে ফেলবে।'

বলুর কাঁদকাঁদ মুখ দেখে মিসেস মদন আঙুল নেড়ে বললেন, 'চুপ, চুপ, মামাবাবু মারবেন।' ছোট্ট এই 'মামা' শব্দ দিয়ে মিসেস মদন সেঠীর সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ নির্ণয় করলেন। নিজের বাপের বাড়ির কথা সব বলতে লাগলেন। কথায় কথায় তাঁর নামটাও জানিয়ে দিলেন– 'ঊর্মিলা।'

বসে বসে সন্ধ্যে গড়িয়ে এল, তারপর রাত্রি গভীর হয়। আকাশে চাঁদ উঠেছে। কাছে চিড় গাছের ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না ওঁদের গায়ে এসে পড়েছে। বলু-ঘরে ঘুমিয়ে। ঊর্মিলা ভাবে এই নির্জন জ্যোৎস্নারাতে দু'টি প্রাণী। ভয় ও ব্যাকুলতার দোটানায় মিসেস মদন, তাঁর দেহে ও মনে একটা অজানা আশঙ্কা।

বাইরে কনকনে শীতের হাওয়া। ভেতরে আরও ঘর ছিল। খানসামা বুদ্ধি খাটিয়ে দুজনকার আসবাবপত্র এক মনে করে বিছানাও এক ঘরে করেছিল। এ ঘরে বিছানা পাততে বারণ করাও হয়নি। এক ঘরে শোবার কথা ভেবেই মিসেস মদনের প্রাণ শুকিয়ে যায়। ভাবেন, দূর, এটাও কি সম্ভব?

বেশ খানিকটা রাত কেটে গেল। সেঠী বললেন, 'আপনার শীতে কষ্ট হবে, ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন।'

'আপনি?'

'আমার ঘুম পাচ্ছে না।'

মিসেস মদন ভালভাবেই জানতেন তাঁর জন্যে সেঠী সারারাত বাইরে কাটিয়ে দেবেন। '...উঃ! কি ভদ্রলোক।'

নিজের এক আত্মীয়ের খুব লেখাপড়া জানা একটি মেয়ের সম্বন্ধে সেঠীকে অনেক কথা বললেন। বিয়ের কথা ভেবে মিসেস মদন বলেন, 'মেয়েটিকে আপনি বিয়ে করে ফেলুন না কেন।'

সেঠী উত্তর দিলেন, 'জীবনের আটচলিশটা বছর যখন এইভাবে কেটে গেল তখন বাকি ক'টা বছরও নিশ্চয়ই কেটে যাবে। আর বিয়ে তো একটা বাজিখেলা– জিততেও পারি, আবার হেরেও যেতে পারি।'

সেঠী আর একবার ঊর্মিলাকে ভেতরে গিয়ে শুতে বললেন। উত্তরে ঊর্মিলা বলে, 'বাইরে চাঁদের আলো, বেশ ভাল লাগছে, তাছাড়া ঠাণ্ডাও তো বিশেষ নেই। কেউই ভেতরে গেলেন না, ওখানেই বসে রইলেন। কখনও সেঠী কিছু বলছেন আর ঊর্মিলা শুনছেন, আবার কখনও ঊর্মিলা বলে যান আর সেঠী শোনেন। নবমীর চাঁদ পাহাড়ের আড়ালে ঢলে পড়ল। সময় জানবার কোনও উপায় নেই। অর্ধেক রাত কেটে গেছে। শীতে দু'জনেই কাঁপছিলেন। ঊর্মিলা মেনে নিতে পারছিলেন না যে তাঁর জন্যে সেঠী শীতে এরকমভাবে কষ্ট ভোগ করবেন। তাঁর অসুখও তো করতে পারে। দাঁড়িয়ে উঠে বলেন, 'আসুন, ভেতরে যাওয়া যাক। বাড়িতে কি সকলে একঘরে শুই না?' দু'জনে ঘরে যেতে যেতে সেঠী ঊর্মিলার পিঠের ওপর হাত রাখলেন। বিছানায় ঢুকে যে যার কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

সেঠীকে বারেবারেই ড্যালহৌসি যেতে হয়। মিলিটারি ব্যারাক তৈরি করার ঠিকা তিনি নিয়েছেন। সেঠী তার সম্পর্কের বোনকে কেন যে বিয়ে করতে রাজি নন, তা ঊর্মিলা বুঝে উঠতে পারেন না। তাঁর সম্বন্ধে সেঠীর মনোভাব বুঝতে পেরেও তা ঊর্মিলা আমল দিতে রাজি নন। গতবারে সেঠী স্পষ্টই বলে দিয়েছিলেন, 'পেট ভরে কুমড়ো খাওয়ার চেয়ে কমলালেবুর সুগন্ধ উপভোগ করাও অনেক শ্রেয়।' সোয়েটার বুনতে বুনতে ঊর্মিলা বুঝতে পারেন কমলালেবু কথাটা তাঁকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সেঠীর সব আচরণগুলিও তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

বন্ধ রাস্তা সকালেই খুলে গিয়েছিল। স্থির হল, চাটা খেয়েই যাত্রা করা হবে। 'রাত্তিরে ভাল ঘুম হয়েছে নিশ্চয়ই', সেঠী হেসে জিজ্ঞেস করেন।

ঊর্মিলাও ঈষৎ হেসে বললেন, 'আপনিও নিশ্চয়ই ভালভাবে ঘুমিয়েছেন?'

দু'জনেই বুঝলেন যে কারুরই ঘুম হয়নি! কিন্তু অনিদ্রায় রাত কাটালেও কাউকেই ক্লান্ত মনে হচ্ছিল না।

সেঠী মন্তব্য করেন, 'এই বাংলোটা ছেড়ে যেতে একটুও ইচ্ছে করছে না।'

ঊর্মিলা করুণ দৃষ্টিতে সেঠীর দিতে চেয়ে চোখ নীচু করে নেন, মুখে কথা জোগায় না। নিজের স্বামীকে দেখেছেন, কিন্তু এরকম উদারতা, সংযম ও অনুরাগ কখনও দেখেননি। সমস্ত অন্তর দিয়ে ঊর্মিলা যেন একটা কথাই বলতে চাইছেন, 'তুমি মহৎ, তুমি মহান।' কিন্তু নীরব, মুখ ফুটে বলতে তাঁর লজ্জা। পুরুষের কাছে স্ত্রী জাতির সর্বদাই পরাজয়। আশ্রয় দিলেও যা, লাঞ্ছনা সইতে হলেও তাই।

যাবার আগে সেঠী একটা অনুরোধ জানালেন, 'যদি আপনার আপত্তি না থাকে তবে এই বাংলোতে আপনার একটা ছবি তুলতে চাই।'

আপত্তি? ঊর্মিলার আবার আপত্তি কি থাকতে পারে? সকৃতজ্ঞ নয়নে সেঠীর দিকে শুধু একবার তাকালেন। ঊর্মিলা ঘাড় বেঁকিয়ে থামে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। সেঠী কয়েকটা ছবি তুলে নেন।

দুমা সে কত পরিবর্তনই না হয়েছে। মদন মিলিটারি একাউন্টস অফিসের একশো টাকা মাইনের চাকরি ছেড়ে সেঠী এন্ড কোম্পানির একাউন্টেন্ট, মাসে তিনশো টাকা মাইনে। ঊর্মিলা আর ষাট টাকা মাইনের মাস্টারনী নন। এখন তিনি নিজের ছোট্ট বাড়ির সামনে বড় রোদের ছাতা লাগিয়ে মিঠে রোদে বসে বলুর জন্যে সোয়েটার বোনেন। গাণ্ডে জেলার কৃষ্ণবর্ণা আয়া বলুকে রাস্তায় বেড়াতে নিয়ে যায়।

সেঠীকে বারেবারেই ড্যালহৌসি যেতে হয়। মিলিটারি ব্যারাক তৈরি করার ঠিকা তিনি নিয়েছেন। সেঠী তার সম্পর্কের বোনকে কেন যে বিয়ে করতে রাজি নন, তা ঊর্মিলা বুঝে উঠতে পারেন না। তাঁর সম্বন্ধে সেঠীর মনোভাব বুঝতে পেরেও তা ঊর্মিলা আমল দিতে রাজি নন। গতবারে সেঠী স্পষ্টই বলে দিয়েছিলেন, 'পেট ভরে কুমড়ো খাওয়ার চেয়ে কমলালেবুর সুগন্ধ উপভোগ করাও অনেক শ্রেয়।' সোয়েটার বুনতে বুনতে ঊর্মিলা বুঝতে পারেন কমলালেবু কথাটা তাঁকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সেঠীর সব আচরণগুলিও তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ঊর্মিলার নিজের মাথায় বিলি কাটা দেখতে সেঠীর খুব ভাল লাগে। কোনও কথা বলার না থাকলেও ওকে সামনে বসিয়ে রাখতে সেঠী ভালবাসে। সেঠীর এনে দেওয়া জামাকাপড়গুলি সেঠীর সামনেই পরতে হত। সেঠীর কথা অমান্য করা তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। সেঠীর চাহিদায় তাকে হাতকাটা পিঠকাটা ব্লাউজও পরতে হত। সেঠীর পছন্দসই জামাকাপড় পরতে ঊর্মিলার নিজেরও ভাল লাগত। কিন্তু ভাবত তার নিজস্ব অস্তিত্ব বলে আর কি রইল?

গত বুধবারে সেঠী অনেক রাত পর্যন্ত তাঁদের বাড়িতেই ছিলেন। কি বলেছিলেন সেঠী? ...তিনি ঊর্মিলাকে স্পর্শ করেননি, দূরেই বসেছিলেন। তবু কিইবা বাকি ছিল? ব লেছিলেন, 'আমি তোমায় ভালবাসি। আমার ভালবাসার পেছনে কোনও স্বার্থ নেই। তুমি আমার হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি। তোমায় দেখতে চাই...নিজের করে ভাবতে চাই।'

ঊর্মিলা সেটা মেনে নিতে পারেননি। তিনি কেঁদে ফেলেছিলেন। 'আমায় ক্ষমা কর–' এই কথা বলে সেঠী চুপচাপ উঠে পড়েছিলেন।

আজ বুনতে বুনতে সেই রাতের দৃশ্যটি তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ভাবতে থাকেন সেদিন রাত্তিরের ব্যবহারটা কি ঠিক হয়েছিল?

যে লোক কোনও কিছু প্রত্যাশা না করে নিজের সারা জীবনের রোজগার তাঁকে উৎসর্গ করে দিচ্ছে, বিনিময়ে কিছুই চায় না– মুখে যাই বলুক না কেন...তাকে কি নিরাশ করা...।

সেঠী শুধু বলেছিলেন যে তাঁর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী তিনি বলুকেই করবেন– কিন্তু এক শর্তে। বলুর আর কোনও ভাগীদার থাকবে না। ...অর্থাৎ ঊর্মিলার গর্ভে আর কোন সন্তান হবে না– তা ঊর্মিলাকে তিনি স্পর্শ করুন বা না করুন। বলু-তাঁর, মদনও তাঁর আর ঊর্মিলা তো তাঁরই।

সেঠী কত সংযমী, কত উদার, কত মহৎ। সব কিছুই তিনি কি করে দিয়ে দিলেন...? ঊর্মিলা তো সেঠীকে কিছুই দিতে পারলেন না। অবশ্য দেবার সুযোগও তিনি পাননি। সেঠী কল্পনাতেই যেন সব কিছু অধিকার করে নিয়েছেন, কিন্তু কত সহজে? যেন সব কিছুই এক যাদুর স্পর্শে, সে যাদু তিনি জানেন। এই পরশ থেকে মুক্তি পাবার কোনও পথ ঊর্মিলার নেই। বলুর নেই, মদনেরও নেই– যেন ওরা সবাই নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছে। সেঠী যদি কাল আবার আসেন আর উদাসভাবে আবার সেই কথাটিই বলেন? এককোণে বসে যদি বলেন, 'তোমাকে চাই... তবে কি এখনও ঊর্মিলা না বলতে পারবেন? একবার তো 'না' বলে তিনি মনে মনে অনেক অনুতাপ করেছেন। ঊর্মিলার এতে এত ভাববার কি আছে? তবুও আর একবার 'না' বলতে চাইল তাঁর মন। পরক্ষণেই আবার মনে হয় 'না' করবার তাঁর কি কোনও অধিকার আছে? এ অধিকার সকলের থাকলেও তাঁর আর নেই। নিজের বিবেকের কাছে সে অধিকার তিনি হারিয়েছেন। ...বারবণিতার জীবনের সঙ্গে তাঁর জীবনের আর এমন কি তফাৎ... ঊর্মিলার গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে।

মনে পড়ে দু'মাস আগের কথা। ছোট ছোট দুটো ঘরের মধ্যেই তাঁর সংসার। ঊর্মিলা শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে ছেলেকে কোলে নিতেন। তারপর হাঁদা চাকরের পেছনে বকে মরতেন। অনেক চাহিদাই তো তিনি মেটাতে পারতেন না। কিন্তু তাঁর 'হ্যাঁ' বা 'না' বলার একটা অধিকার তো ছিল। তিনি নিজের খুশিমত যা খুশি তাই করতে পারতেন... সিগারেট কোম্পানির সেই হাসিখুশি বাবুটি কত ভাল ও সজ্জন ছিলেন। কিন্তু তাঁকেও ঊর্মিলা সব সময় নাই ক রেছেন।

আবার ভাবেন... সেঠী আজ হয়তো আসতে পারেন। ছলছল চোখে ফটকের দিকে তাকিয়ে থাকেন। সে দৃষ্টিতে বাকুলতা নেই, আছে শুধু বেদনার ছাপ।

অনুবাদ **ইন্দ্রাণী সরকার**

লেখক পরিচিতি

যশপালের জন্ম ১৯৭৬) ১৯০৩ সালে পঞ্জাবের পূর্ব কাঙড়ার ফিরোজপুর ক্যান্টনমেন্টে। স্থায়ী বাস ছিল লক্ষ্ণৌয়ে। বহুকাল বিপবী দলের সঙ্গে কাজ করেন ও জেল খাটেন। ১৯৩৮ সাল থেকে লিখতে শুরু করেন। একাধারে ঔপন্যাসিক, গল্প লেখক ও চিন্তানায়ক যশপাল *দাদা কমরেড*, *পার্টি কমরেড*, *দেশদ্রোহী*, *মনুষ্য কে রূপ*, *দিব্যা* ও *ঝুঠা-সচ* নামে বিখ্যাত সব উপন্যাস লিখেছেন। গল্পের মধ্যে *পিঞ্জরে কী উড়ান*, *জ্ঞানদান*, *বহু দুনিয়া*, *ধর্মযুদ্ধ*, *চিত্র কা শীর্ষক* ও *তুমনে ক্কেও কহা থা ময় সুন্দর হুঁ* উলেখযোগ্য।

শেষ পাতা

প্র.না.বি. প্রমথনাথ বিশী

মো. সফিকুল ইসলাম

প্র.না.বি. নামে সমধিক খ্যাত কবি সাহিত্যসমালোচক নাট্যকার ও রম্যরচয়িতা প্রমথনাথ বিশীর জন্ম ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের ১১ জুন অবিভক্ত বাংলার রাজশাহী জেলার জোয়াড়ি গ্রামে। পিতা নলিনীনাথ বিশী ও মাতা সরোজবাসিনী দেবী।

তাঁর বাল্য ও কৈশোর কাটে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসান্নিধ্যে। তিনি ১৭ বছর শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মবিদ্যালয়ে পড়াশুনো করেন। সেখান থেকে ১৯১৯ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। এরপর ১৯২৭ সালে আইন এবং ১৯২৯ সালে ইংরেজিতে অনার্সসহ বিএ পাশ করেন রাজশাহী কলেজ থেকে। ১৯৩২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এমএ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি সম্ভবত প্রথম প্রাইভেট ছাত্র যিনি 'রেকর্ড মার্কস্'সহ প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। এরপর তিনি রামতনু লাহিড়ী বৃত্তি পেয়ে গবেষণা সম্পন্ন করেন। ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত কলকাতার রিপন কলেজে বাংলায় অধ্যাপনা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রঅধ্যাপক এবং বাংলা বিভাগের প্রধানের পদ অলংকৃত করেন।

১৯৩১ সালে তিনি *শান্তিনিকেতন* পত্রিকা সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত হন। এই অভিজ্ঞতা উত্তরজীবনে তাঁর প্রভূত কাজে লাগে। ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত তিনি *আনন্দবাজার পত্রিকায়* সহ্লস ম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। *আনন্দবাজার পত্রিকা* থেকে তিনি রিপন কলেজে অধ্যাপনা পেশায় যোগ দেন। এসময় তাঁকে দু'টি পেশার পার্থক্য বিচার করতে বলা হলে তিনি একটিমাত্র বাক্য বলেছিলেন– 'শিক্ষকতা হচ্ছে পণ্ডিতের মূর্খতা আর সাংবাদিকতা মূর্খের পাণ্ডিত্য।'

১৯৬২ থেকে '৬৮ সাল অবধি তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দেন। এরপর ১৯৭২ সাল থেকে '৭৮ পর্যন্ত রাজ্যসভার সদস্য মনোনীত হয়ে দিল্লি বাস করেন। *লালকেল্লা* তাঁর এসময়ের অভিজ্ঞতার ফসল। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, সমালোচনা, রম্যরচনা প্রভৃতি সাহিত্যের সব ক্ষেত্রেই তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন।

প্রমথনাথ ১৯৬০ সালে *কেরী সাহেবের মুন্সী* উপন্যাসের জন্য 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করেন। এরপর ১৯৬১ সালে 'প্রফুল্লকুমার স্মৃতি পুরস্কার', '৮১ সালে 'শরৎ পুরস্কার', '৮২ সালে 'বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার' এবং '৮৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মান 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদকে' ভূষিত হন। এছাড়া ১৯৭১ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত করেন।

তাঁর বহুল পঠিত উপন্যাসের মধ্যে *জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার, অশ্বত্থের অভিশাপ, কেরী সাহেবের মুন্সী, লালকেল্লা, বঙ্গভঙ্গ* উল্লেখযোগ্য। গল্পগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব, ষষ্ঠ পর্ব, অশরীরী, গল্পের মতো, গালি ও গল্প, ধরেপাতা, ব্রহ্মার হাসি* ইত্যাদি। নাটকের মধ্যে *ঋণং কৃত্যা, ঘৃতং পিবেৎ, মৌচাকে ঢিল* প্রভৃতি। তাঁর কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *দেয়ালী, বিদ্যাসুন্দর, বসন্তসেনা, প্রাচীন আসামী হইতে, যুক্তবেণী, হংসমিথুন, উত্তর মেঘ* প্রভৃতি। তাঁর রচনাসম্ভার বিপুল এবং বিচিত্র।

নিজের সাহিত্যিক সত্তা সম্বন্ধে প্রমথনাথের একটি স্পষ্ট দৃঢ়মূল মতামত ছিল। একবার শ্রী শঙ্করীপ্রসাদ বসুর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন,

> 'বাপু হে! আমার ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, যা চাইবে সব পাবে। তোমরা যাকে 'অলরাউন্ডার' বল আর কি? আরে, সেইটাই তো সমালোচকদের আর সাহিত্যিকদের রাগের কারণ। আমার গায়ে কোন লেবেল লাগাতে পারে না। কি বলবে আমাকে– কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পলেখক, সমালোচক, হাস্যরসিক? ...তোমাকে চুপিচুপি বলি, অনেকরকম লিখি বলে– যে সব সাহিত্যিক একটার বেশি ধরনে লিখতে পারে না, তারা আমার উপর বেজায় চটা।'

নিজের সাহিত্যিক সত্তা সম্বন্ধে অন্তিম অনুশাসনে পুত্রকন্যাদের উদ্দেশে তিনি লেখেন,

> 'আজকাল দেখিতেছি কোন সাহিত্যিকের মৃত্যু হইলে তাহার স্ত্রী পুত্রকন্যা ও নিকট আত্মীয়গণ তাহার স্মৃতিরক্ষার্থ উঠিয়া পড়িয়া লাগে। হয়ত বসতবাড়ির অংশবিশেষ সাহিত্যিকের নামে অমুক পরিষৎ, অমুক স্মৃতিমন্দির প্রভৃতি রাখে। সংবাদ্রূপ ত্রাদিতে তদ্বির করিয়া জন্মদিন বা মৃত্যুদিন উপলক্ষ্যে সভা করিয়া বহু উপরোধ করিয়া বক্তা সংগ্রহ করে, গায়ক সংগ্রহ করে এবং স্মৃতিরক্ষার নামে একটা তামাসা করে। কিংবা একটা বক্তৃতামালা ও পদক ঘোষণা করে। অথবা একটা রাস্তা বা পার্কের নাম বদল করিয়া সাহিত্যিকের নামে নামকরণ করিবার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে ঘোরাঘুরি করে।
>
> তোমরা কখনও এরকম দীনতা প্রকাশ করিবে না। কখনো না, কখনো না, কখনো না। আমি সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার আশায় কখনও দীনতা প্রকাশ অর্থাৎ তদ্বির তদারক অনুরোধ উপরোধ করি নাই, তোমরাও করিবে না।...'

অসম্ভব রসিক মানুষ ছিলেন তিনি। পরস্পরকে বই উৎসর্গ করা কিংবা দান করা আমাদের সাহিত্যিক মহলের একটি রেওয়াজ। যাঁরা দেন তাঁরাও জানেন যে সময়াভাবে হয়তো এই বইয়ের রসাস্বাদন সম্ভব হবে না প্রাপকের, তবু সৌজন্য রক্ষার দায় বলে একটা কথা আছে। শ্রীভবতোষ দত্তকে একটি বই উপহার দিয়ে প্রমথনাথ লিখেছিলেন–

'দানে পাওয়া বই পড়ে না কেহই
তবু দিই সেটা স্বভাবদোষ।
নাহিক নালিশ হবে তো বালিশ
দয়া করে নিন শ্রীভবতোষ।'

১৯৮৫ সালের ১০ মে কলকাতার রামকৃষ্ণ সেবাসদনে 'ইকোলাই' ইনফেকশনে তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন।

মো. সফিকুল ইসলাম
সংস্কৃতিকর্মী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশ সফর

Regd. No. DA 355 Bharat Bichitra June 2015

সত্যমেব জয়তে

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা

জ্ঞাতব্য তথ্য

ঢাকার ধানমন্ডিতে নতুন আইভিএসি কেন্দ্র

ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপলিকেশন সেন্টার (আইভিএসি)-এর মাধ্যমে ভারতীয় ভিসা আবেদন গ্রহণের জন্য ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকার স্বীকৃত এজেন্ট এস্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই) আনন্দের সঙ্গে ১জানুয়ারি, ২০১৫ বৃহস্পতিবার থেকে ভিসার আবেদনপত্র গ্রহণ ও বিতরণের জন্য ঢাকায় একটি নতুন আইভিএসি সুবিধাদানের ঘোষণা দিচ্ছে।

ঠিকানা

আইভিএসি কেন্দ্র, বাড়ি ২৪, সড়ক ২, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৫

কার্যক্রমকাল

রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার– আবেদনপত্র গ্রহণ সকাল ৮.০০টা থেকে দুপুর ১.০০টা।
রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার– আবেদনপত্র বিতরণ বিকাল ৩.০০টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০টা।
আইভিএসি-র সব কেন্দ্রে সব ধরনের ভিসা আবেদন গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশে এখন নিম্নোক্ত আইভিএসি কেন্দ্র বিদ্যমান। এগুলি হচ্ছে: আইভিএসি, গুলশান, ঢাকা ॥ আইভিএসি, মতিঝিল, ঢাকা ॥ আইভিএসি, ধানমন্ডি, ঢাকা (নতুন) ॥ আইভিএসি, চট্টগ্রাম ॥ আইভিএসি, সিলেট আইভিএসি, খুলনা ॥ আইভিএসি, রাজশাহী।
ভিসা আবেদন করার সময় আবেদনকারীদের সঠিক বিভাগ নির্ধারণ করে আবেদন করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সব দলিল সঠিক, সম্পূর্ণ ও অবিকল হওয়া চাই। আবেদনকারীদের এজেন্ট ও মধ্যবর্তী মানুষদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার এবং এসব ক্ষেত্রে নিকটতম থানা/আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আইভিএসি বাংলাদেশে তার পক্ষে কাজ করার জন্য কোন ব্যক্তি/সংস্থাকে অনুমোদন দেয়নি।

পুনর্নির্ধারিত প্রক্রিয়া ফি

০১.০১.২০১৫ থেকে পুনর্নির্ধারিত ভিসা প্রক্রিয়া ফি নিম্নোক্ত হারে কার্যকর হবে:
১. ঢাকার সব আইভিএসি কেন্দ্র– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ২. আইভিএসি, চট্টগ্রাম– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ৩. আইভিএসি, রাজশাহী– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ৪. আইভিএসি, সিলেট– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ॥ ৫. আইভিএসি, খুলনা– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০।

আলোকচিত্র আপলোডের নতুন পদ্ধতি:

০১.০১.২০১৫ থেকে বিশেষভাবে কার্যকর, আবেদনকারীদের অনলাইন আবেদনপত্রে দেওয়া নির্ধারিত জায়গায় তাদের আলোকচিত্র স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। স্ক্যানকৃত আলোকচিত্র ছাড়া আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে।

মেডিক্যাল ভিসা

আইভিএসি, গুলশান কেন্দ্রে একটি বিশেষ মেডিক্যাল এমারজেন্সি ভিসা কাউন্টার রয়েছে। ই-টোকেন ছাড়াও আইভিএসি, গুলশান কেন্দ্রে আগে এলে আগে পাবেন ভিত্তিতে মেডিক্যাল এমারজেন্সি ভিসা আবেদন জমা দেওয়া যাবে।

হেল্পলাইনসমূহ

হেল্পলাইন টেলিফোন/ ফ্যাক্স/ ই-মেইলসমূহ: ০০-৮৮-০২ ৮৮৩৩৬৩২২ ॥ ০০-৮৮-০২ ৯৮৯৩০০৬ ॥ ০০-৮৮-০১৭১৩ ৩৮৯৪৯৯
০০-৮৮-০২ ৯৮৬৩২২৯ (ফ্যাক্স) ॥ visahelp@ivacbd.com. আরো সাহায্যের জন্য ই-মেইল: visahelp@hcidhaka.gov.in
ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত যে-কোন ধরনের প্রশ্নের জবাব পেতে ভিজিট করুন: http://www.ivacbd.com/faq.php

জনস্বার্থে ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা কর্তৃক প্রচারিত